বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৭ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৬

সাহিত্য ও অর্থনীতি: বাংলার কয়েকটি দুর্ভিক্ষ

বিনায়ক সেন*

১। ঋণং কৃত্বা

কথাটা এর আগেও কেউ কেউ বলেছিলেন, কিন্তু কৌশিক বসু যেভাবে বলেছিলেন তাতে করে অর্থনীতি ও সাহিত্যের সম্পর্কের বিষয়টা অনেকের মনেই গেঁথে গিয়েছিল। বসু তার 'এনালাইটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্স: দ্য লেস ডেভেলপড্ ইকনমি রিভিজিটেড' গ্রন্থে এক পর্যায়ে আকস্মিকভাবেই শিবরাম চক্রবর্ত্তীর 'ঋণং কৃত্বা' গল্পটির সবিস্তার বর্ণনা দেন। গল্পটা এমন: শিবরামের পাঁচশত টাকার জরুরি দরকার হয়ে পড়েছে মাসের বাড়ি ভাড়া দেওয়ার জন্য। এনিয়ে বাড়িওয়ালার কাছে অনেক কথাও শুনতে হয়েছে তাকে। কোনো উপায় না দেখে তিনি তার বন্ধু হর্ষবর্ধনের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু ধার নিতে গেলে ধার ফেরত দেওয়ারও নিশ্চয়তা থাকা চাই। অত-শত না ভেবে হর্ষবর্ধনকে তিনি বললেন, 'বেশি নয় শ-পাঁচেক। আজ তো বুধবার, শনিবার দিনই টাকাটা আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেবো।' ধার পেলেন বটে, কিন্তু টাকা ফেরত দেবেন কী' করে অত তাড়াতাড়ি? এরকম ভাবছেন যখন, হঠাৎই রাস্তায় তার দেখা হয়ে গেল হর্ষবর্ধনের ছোট ভাই গোবর্ধনের সাথে। 'গোবর্ধন ভায়া, যদি কথা দাও যে তোমার দাদাকে বলবে না তাহলে একটা কথা বলি।' গোবর্ধন তাকে আশ্বস্ত করল। 'অন্য কিছু নয়, কথাটা হচ্ছে এই, আমাকে শ-পাঁচেক টাকা ধার দিতে পারো– দিন কয়েকের জন্য? আজ তো শনিবার? এই বুধবার সন্ধ্যের মধ্যেই টাকাটা আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেবো।' গোবর্ধনের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে শিবরাম এবার হর্ষবর্ধনকে তার ধারটা ফেরত দিয়ে দিলেন। এতে করে 'ভাল ঋণগ্রহীতা' হিসেবে শিবরামের ওপরে আস্থা আরও বেড়ে গেল। পরের সপ্তাহে বুধবার দিনই অবশ্য আবার হর্ষবর্ধনের দ্বারস্থ হতে হল তাকে– গোবর্ধনকে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য। টাকা পেয়ে গোবর্ধনও সন্তুষ্ট, তবে বুধবার টাকা ফেরত দেওয়ার কিছু পরেই আবারো ধার করতে হল শিবরামকে– এবারে শনিবার হর্ষবর্ধনকে তার ধার শোধ দেওয়ার জন্য। এইভাবে 'হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন, গোবর্ধন আর হর্ষবর্ধন–শনিবার আর বুধবারের দু-ধারের টানাপোড়েন' চলতে থাকল। অনেক দিন পর্যন্ত এটা চলছিল, কিন্তু এভাবে কতদিন আর চালানো যায়! অর্থনীতির পরিভাষায়, এরকম দায়দেনার চক্র 'সাসটেইনেবল' হয় না। এর পরের অংশ শিবরামের অননুকরণীয় ভাষায় তুলে ধরছি:

'হর্ষবর্ধন বাবু ভাই গোবর্ধন, একটা কথা আমি বলবো, কিছু মনে করো না–' বলে আমি শুরু করি: 'ভাই গোবর্ধন, তুমি প্রত্যেক বুধবার হর্ষবর্ধন বাবুকে পাঁচশো টাকা দেবে। আর হর্ষবর্ধন বাবু, আপনি প্রত্যেক শনিবার পাঁচশো টাকা আপনার ভাই গোবর্ধনকে দেবেন। হর্ষবর্ধনবাবু, আপনি বুধবার, আর গোবর্ধন, তুমি শনিবার মনে থাকবে তো?'

'ব্যাপার কি!' হর্ষবর্ধনতো হতভম্ব: 'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

---

*গবেষণা পরিচালক, বিআইডিএস।

'ব্যাপার এই যে, ব্যাপারটা আমি একেবারে মিটিয়ে ফেলতে চাই। আপনাদের দুজনের মধ্যে আমি আর থাকতে চাই না।'

কৌশিক বসু এই গল্পটি প্রোথিত করেছেন তার বইয়ের 'ইন্টারন্যাশনাল ডেট' পরিচ্ছেদে। কিন্তু আমাদের দেশের সাম্প্রতিক কালের একটি বহুল আলোচিত বিষয় খেলাপি ঋণের ক্ষেত্রেও শিবরাম চক্রবর্ত্তীর গল্পটি শিক্ষণীয় হতে পারে। একাধিক ঋণদাতার কাছে যারা একই সময়ে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন, তারা অনেক দিন পর্যন্ত 'শনিবার-বুধবার' জাতীয় ঋণ-চালাচালি (Credit Juggling) করতে পারেন এবং এতে করে সাময়িকভাবে 'ভাল' ঋণগ্রহীতা হিসেবে তাদের সুখ্যাতি বেড়েও যেতে পারে। এর ফলে যিনি কোনো ব্যাংকের কাছ থেকে কেবল সীমিত আকারের ঋণই প্রত্যাশা করতে পারতেন, ঋণ-চালাচালির মাধ্যমে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে তিনি বৃহদাকার ঋণ পাওয়ার পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করতে পারেন। ব্যাংকের জন্য এর মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল হতে পারে মারাত্মক। কেননা যখন এক উৎস থেকে ধার নিয়ে আরেক উৎসের ধার ফেরত দেওয়ার ব্যাপারটি ধরা পড়ে তখন হয়ত বড় বেশি দেরী হয়ে গেছে। এই অশুভ ঋণ-চালাচালির ব্যবস্থার ফলে বড় আকারের ঋণ মন্দ ঋণে বা খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি দেখা দেয়। এদিকটা শিবরাম চক্রবর্ত্তীর দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রথম বার হর্ষবর্ধনকে তার ধার ফেরত দেওয়ার পর তিনি বলছেন:

'ভাবছেন এই যে, এই পাঁচশো টাকা ফিরিয়ে দিয়ে নিজের ক্রেডিট খাটিয়ে এর পরে আমি ফের হাজার টাকা ধার নেবো। তারপর সেটা ফেরত দিয়ে আবার দু হাজার চাইবো। আর এমনি করে ধারটা দশ-হাজারে দাঁড় করিয়ে তারপরে আর এ-ধারই মাড়াবো না? এই তো ভাবছেন আপনি?'

এক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, মাল্টিপল লেন্ডারদের মধ্যে ঋণ-চালাচালির মাধ্যমে একজন মন্দ ঋণগ্রহীতা কেবল সাময়িক সময়ের জন্যই পার পেতে পারে। একসময় তাকে ধরা পড়তেই হয়, যেমনটা শিবরামকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল একদিন হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন উভয়েরই সামনে। কেননা একজনের থেকে ধার-কর্জ করে ধার শোধ করার 'শনিবার-বুধবার' জাতীয় ব্যবস্থা টিঁকে আছে একটা শর্তের ওপরে, যাকে অর্থনীতিবিদরা বলেন 'ইনফরমেশন এসিমেট্রি'। গোবর্ধনকে শিবরাম বারবার বলে দিয়েছিলেন যে, তার ধার করার ব্যাপারটি যেন হর্ষবর্ধনকে জানানো না হয়। আধুনিক ব্যবস্থায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ কাউকে বড় আকারের ঋণ দেওয়ার আগে নিজেদের মধ্যে তথ্য বিনিময় করতে পারে বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর সাহায্য নিতে পারে। সেক্ষেত্রে শিবরামের 'শনিবার-বুধবার' ব্যবস্থা কাজ করতে পারত না। যাহোক, উপরে যে সম্ভাবনার কথা লিখলাম তা শুধু আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নয়, গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্রঋণ খাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'শনিবার-বুধবার' ব্যবস্থায় এক এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে অন্য এনজিওর কিস্তি পরিশোধ করা খুবই সম্ভব। যদিও বিভিন্ন এনজিও উৎস থেকে একই সঙ্গে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বিধিনিষেধ রয়েছে, তারপরও দেখা যায় এক-তৃতীয়াংশ বা তারও বেশি ঋণগ্রহীতা বিভিন্ন সূত্রের কাছে ঋণী থাকছে। সেটার ন্যায়সঙ্গত কারণও রয়েছে: একজন ঋণগ্রহীতা হয়ত তার ব্যবসা অবিলম্বে বাড়াতে চান, সেজন্যে তাকে নানা উৎসের কাছে হাত বাড়াতে হয়। সবাই হয়ত সেকারণেই কেবল বহুবিধ উৎসের কাছে ঋণ খোঁজেন না। এক শ্রেণীর ঋণগ্রহীতা এই আধুনিক আর্থিক-ব্যবস্থাতেও বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ লাভ করে এবং নিয়মিত বা অনিয়মিত ভাবে সেসব ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে দীর্ঘ সময় নিরাপদে কাটিয়ে দিতে পারে। এবং এক পর্যায়ে, ধরা পড়ে গেলে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে দিব্যি বলে দিতে পারেন, 'ব্যাপারটা আমি একেবারে

মিটিয়ে ফেলতে চাই। আপনারা কে কত ঋণ মওকুফ করবেন সেটা নিজেরাই ঠিক করে নিন। আপনাদের মধ্যে আমি আর থাকতে চাই না।' ততদিনে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে এতটাই দায়দেনা জমেছে তার নামে, কোনো একক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাধ্য কি তাকে ধরে।

২। অমর্ত্য সেনের উদাহরণ

অর্থশাস্ত্র ও সাহিত্যের অন্তর্লীন সম্পর্ক অনুধাবন করার জন্য কৌশিক বসুর শিক্ষক অমর্ত্য সেনের মানব উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়, বৈষম্য ও দুর্ভিক্ষ বিষয়ক লেখাগুলোকে 'প্রতিনিধিত্বশীল রচনা' হিসেবে পাঠ করা যায়। কয়েকটি দ্রুত উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করছি। প্রথমেই মনে পড়বে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট তথা মানব উন্নয়ন ধারণার কথা। ইউএনডিপি কর্তৃক সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স বা মানব উন্নয়ন সূচকের পেছনে মৌলিক দার্শনিক প্রেরণা এসেছিল দ্বিবিধ উৎস থেকে। একটি হচ্ছে এরিস্টটলের নীতিশাস্ত্র, বিশেষত 'নিকোমেখিয়ান এথিকস'। অন্যটি হচ্ছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ। প্রথম সূচকটি অপেক্ষাকৃত আলোচিত, কিন্তু শেষের সূচকটির প্রতি সেনই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। গল্পটি এমন: বানপ্রস্থে যাওয়ার আগে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ডেকে ধন সম্পদের বরদানের ইচ্ছা পোষণ করলেন। 'যদি সসাগরা পৃথিবী সম্পদে–বৈভবে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং কেবল আমারই করায়ত্ত হয়, তবে কি আমি অমরত্ব প্রাপ্ত হব?' মৈত্রেয়ী বরদানের পূর্বে ঋষিকে প্রশ্ন করলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'না, তোমার জীবনও অন্য যেকোন ধনী ব্যক্তির মতই হবে সেক্ষেত্রে। ধন সম্পদের মাধ্যমে অমরত্ব লাভের কোনই আশা নেই।' সেকথা শুনে মৈত্রেয়ী তখন বলেছিলেন, 'যে নাহং নামৃতা স্যাম তে মোহং কিম কুর্যাম? যা আমাকে অমরত্ব পেতে সাহায্য করবে না তা' দিয়ে আমি কি করব?' একথা উল্লেখ করার পর সেন তার 'দ্য আর্গুমেন্টেটিভ ইনডিয়ান' বইয়ে লিখছেন, 'মৈত্রেয়ীর কেন্দ্রীয় প্রশ্নটি জিএনপি বা জিডিপির প্রবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে উন্নয়ন বিচার করার পদ্ধতির বাইরে উন্নয়নের অন্য ধারণাকে খুঁজে বের করতে ও ব্যাখ্যা করতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করছিল।' যার প্রমাণ মেলে তার 'ডেভেলপমেন্ট এজ ফ্রিডম' বইয়ে।

অন্যত্র, গণতন্ত্রের সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে সেন ব্যালটকেন্দ্রিক ধারণার বাইরে গিয়ে যুক্তিবাদী চর্চা, নাগরিক অধিকার, নির্ভয়ে মতপ্রকাশের ব্যক্তি-স্বাধীনতা, জাতপাত ভেদবুদ্ধির বাইরে সহনশীল সমাজ-প্রতিষ্ঠা, তর্কপ্রিয়তা প্রভৃতি গুণাবলীর ওপর জোর দিয়েছেন। পাবলিক চয়েস স্কুলের স্রষ্টা জেমস বুকাননের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, গণতন্ত্র হচ্ছে 'গভর্ণমেন্ট বাই ডিসকাসন'। এসব প্রতিটি বিষয়ে সেনের নানা লেখায় দর্শন, কবিতা, ইতিহাস, পুরাণ, এক কথায় বৃহত্তর অর্থে সাহিত্য- প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। মৃত্যু সম্পর্কে বলতে গিয়ে রামমোহন রায়ের বরাত দিয়ে সেন লক্ষ করেন যে, মৃত্যু ভয়াবহ সন্দেহ নেই। কিন্তু এর ভয়াবহতা একারণে নয় যে সত্তার বিলয় হচ্ছে। 'ভাবুন একবার, আপনার মৃত্যুর দিনে চারপাশের মানুষজন অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, আর আপনি সেসব কথার ও তর্কের কোনো উত্তর বা প্রত্যুত্তর দিতে পারছেন না।' কেন মতের ও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার বা অসমসত্ত্বার প্রতি জোর দেওয়া দরকার তা বোঝানোর জন্য তিনি আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ কালের একটি বিরল দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতে এসেছিলেন সম্রাট আলেকজান্ডার। এমনিতে এরিস্টটলের কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন, তার ওপরে মহাযোদ্ধা। বীরদর্পে তিনি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এখানে-ওখানে অভিযান করে বেড়াচ্ছেন। এক জায়গায় গিয়ে তিনি দেখলেন, কয়েকজন জৈন ধর্মাবলম্বী দার্শনিক নিজেদের মধ্যে তর্কে-বিতর্কে ব্যস্ত। বিশ্ববিজয়ী গ্রীক সম্রাটের প্রতি মনোযোগ

দেওয়ার আগ্রহ বা সময় কোনোটাই তাদের নেই। এরকম মনোভাবের কি কারণ তা জানতে চাইলে তাদের একজন বললেন, 'হে সম্রাট আলেকজান্ডার [বিশেষ করে তোমার দিকেই আমাদের তাকাতে হবে কেন তা বুঝতে পারছি না।] তুমি যতটা পৃথিবীর জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছ, প্রতিটি মানুষ ততটাই জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের মতোই তুমি মানুষ, পার্থক্য কেবল যে তুমি সবসময় নিজেকে অকাজে ব্যস্ত রাখছ– কোন কাজেই আসছ না, নিজ দেশ থেকে খামোখাই কত শত মাইল দূরে ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছ এখানে, এতে তোমার যেমন বিরক্তি হচ্ছে, অন্যদেরও বিরক্তি উৎপাদন করছ... অচিরেই তোমার মৃত্যু হবে, এবং তখন এই পৃথিবীর ততটাই তোমার অধীন থাকবে যতটা দরকার কেবল তোমাকে কবরস্থ করতে'। কথাগুলো আলেকজান্ডারের পছন্দ হয়েছিল, যদিও বাস্তবে তার পদক্ষেপগুলো ছিল জৈন দার্শনিকদের মতের সম্পূর্ণ বিপরীতে। এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। শাসক গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা এ রকমই হয়ে থাকেন: যে মতকে তারা শ্রেষ্ঠ ও অনুকরণীয় মনে করেন, তাকে তারা কখনো অনুসরণ করেন না।

অর্থনীতি ও সাহিত্যের অন্তর্লীন সম্পর্ক বিশেষ করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের আলোচনায়। ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের ওপরে বিশেষজ্ঞ অমিয় কুমার বাগচী অমর্ত্য সেনের লেখার এদিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলির ১৯৯৮ সালের একটি রচনায় সেন তার 'পভার্টি অ্যান্ড ফেমিন' বইতে নাট্যকার বার্নার্ড শ-এর 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান' নাটকটির একটি দৃশ্যের সবিস্তার উল্লেখ করেছিলেন। সেখানে আইরিশ-আমেরিকান একটি চরিত্র মেলোন এবং তার পুত্রবধূ ভায়োলেট-এর মধ্যে কথা হচ্ছে ১৮৪৭ সালের আয়ারল্যান্ডের দুর্ভিক্ষ নিয়ে। কথাগুলো লক্ষ করার মতো।

'মেলোন: আমার বাবা সেই কালো সাতচল্লিশে ক্ষুধার জ্বালায় মারা গিয়েছিলেন। হয়তো তুমি এর আগে এ নিয়ে শুনে থাকবে।

ভায়োলেট: সেই দুর্ভিক্ষের কথা বলছেন?

মেলোন : না, আমি ক্ষুধার কথা বলছি। যখন কোনো দেশে খাদ্যের প্রাচুর্য থাকে এবং সে দেশ থেকে খাদ্যের রপ্তানি চলতে থাকে, তখন কোনো দুর্ভিক্ষ হতে পারে না। আমার বাবা ক্ষুধার কষ্টে মারা গেছেন, আর আমি ক্ষুধার কষ্টে আমার মায়ের হাত ধরে আমেরিকায় চলে এসেছি।'

ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু পার্থক্যটাকে বড় করে দেখার উপায় নেই। ক্ষুধার কষ্ট এক পর্যায়ে ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী আকার ধারণ করলে তা দুর্ভিক্ষের রূপ নিতে পারে। অমর্ত্য সেন তার কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন, কোনো দেশে খাদ্যের প্রাচুর্য থাকলেও দুর্ভিক্ষ হতে পারে। মেলোন সাহেব যেটা ভেবেছেন সেটা ভুল। খাদ্য সরবরাহে ঘাটতিকেন্দ্রিক চিন্তা দিয়ে দুর্ভিক্ষের প্রকৃতিকে ঠিক বোঝা যাবে না।

ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে জর্জ বার্নাডশ পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই। বাংলার কয়েকটি দুর্ভিক্ষের কথা এখানে আমরা টেনে আনতে পারি, যার প্রতিফলন ঘটেছিল সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে। সাহিত্যের এসব বিবরণী থেকে ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে এক বিশ্বস্ত চিত্র উঠে আসে। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে: (ক) ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ (যা ১১৭৬ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ বা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' হিসেবে পরিচিত); (খ) ১৮৭০ দশকের খাদ্যাভাব বা গণমানুষের মধ্যে ক্ষুধার বিস্তৃতি; (গ) ১৯৪৩ সালের

দুর্ভিক্ষ (যা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' হিসেবে পরিচিত); এবং (ঘ) ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ (যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, মন্বন্তর শুধু ঔপনিবেশিক পটভূমিতেই সংঘটিত হয়নি। উপনিবেশ-উত্তর 'আধুনিক' যুগেও একটি অস্বস্থিকর প্রসঙ্গ হিসেবে এটি থেকে গেছে)। ২০০৭-০৮ সালের ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে আকস্মিক খাদ্য ঘাটতি ও চালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে (যার পরিণামে সামরিক বাহিনী চালিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জনসমর্থনের ভিত প্রবলভাবে নড়ে গিয়েছিল এবং নির্বাচনের দিকে ঝুঁকে পড়তে রাজশক্তি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিল)। অবশ্যই এসব 'এপিসোড'-এ ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের প্রকৃতি একরূপ নয় এবং এদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত বা কনটেক্সটও ভিন্ন। তবে প্রকৃতি ও প্রেক্ষিতের ভিন্নতা আমাদের অভিনিবেশের মূল বিষয়বস্তু নয়। এসব ঘটনাপ্রবাহ কীভাবে সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে, কীভাবে সাহিত্যের পাতায় সেসব বিবরণী উঠে এসেছে এবং এর থেকে সেদিনের অর্থনৈতিক চালচিত্র সম্পর্কে কিছু বিরল উন্মোচন হতে দেখি, যার সঙ্গে আর্কাইভের দলিলপত্র এবং সরকারি তথ্য-পরিসংখ্যানের সাক্ষ্যও সময় সময় নিষ্প্রভ ঠেকে।

বর্তমান লেখাটি ৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। অর্থনীতি ও সাহিত্যের মধ্যে শুভ দৃষ্টি-বিনিময়ের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে প্রবন্ধটির প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে নজর পড়েছে ১৮৭০-র দশকে গ্রাম বাংলায় মৌসুমী ক্ষুধার ব্যাপক বিস্তৃতির প্রতি। এক্ষেত্রে মৌলিক আর্কাইভ গবেষণার কিছু সমসাময়িক সাক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইতিপূর্বে বহু আলোচিত তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ-এর কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই দুর্ভিক্ষের প্রভাব শুধু সমকালীন বিভাগ-পূর্ব বাংলা সাহিত্যেই নয়, পঞ্চাশের যুগের পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের ওপরেও পড়েছিল, তা পাঠককে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর অন্যতম প্রভাবক হিসেবে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধকালীন নীতিমালাও আংশিকভাবে দায়ী সে সম্পর্কে সাহিত্য ও ইতিহাস গবেষণার তথ্য পেশ করা হয়েছে। সর্বশেষ ষষ্ঠ অধ্যায়ে উত্থাপিত হয়েছে প্রায়-বিস্মৃত ও স্পর্শকাতর 'চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গটি। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাহিত্যের যোগান ভারী, কিন্তু সাহিত্যে এর প্রকাশ তুলনামূলকভাবে সীমিত পর্যায়ের। এ বিষয়ে উদাসীনতার প্রশ্নটি জোরেশোরে তোলা হয়েছে প্রবন্ধের শেষভাগে।

৩। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

বাংলা সন ১১৭৬-এর (বা ইংরেজি ১৭৭০ সাল) মন্বন্তরের কারণে বাংলাদেশ 'শ্মশানে' পরিণত হয়। আমি সন্দেহ করি, এই 'শ্মশান' শব্দটির পরবর্তী রাজনৈতিক ব্যবহারের পেছনে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মনস্তাত্ত্বিক ভূমিকা রয়ে গেছে গোচরে-অগোচরে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যমূলক নীতিমালা অনুসরণের পরিপ্রেক্ষিতে সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পোস্টার 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' প্রকাশিত হয় এবং অচিরেই তা জনপ্রিয় স্লোগানে পরিণত হয়। এই স্লোগানে বর্ণিত 'শ্মশান' হওয়ার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরেই প্রথম। এই দুর্ভিক্ষের একশ বছর পরে উইলিয়াম হান্টারের 'দ্য এনালস্ অব রুরাল বেঙ্গল' (১৮৬৮) থেকে জানা যায় : ১৭৭০ সালের মে মাসের পূর্বেই বাংলার 'এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ীই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।' হান্টারের এই বিবরণীটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসের মূল তথ্যভিত্তি জুগিয়েছিল। সম্প্রদায়গত বিভেদবাদী চিন্তার জন্য 'আনন্দমঠ' দুর্নাম কুড়িয়েছিল সঙ্গত কারণেই। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্পর্কে জানার জন্য এবং সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের দুর্ভিক্ষকেন্দ্রিক পটভূমি বোঝার জন্য বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসকে আজও পাঠ করা যেতে পারে।

কীভাবে দুর্ভিক্ষ নেমে এলো বাংলায়, বঙ্কিম তার বিবরণ পেশ করছেন এভাবে– 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই। উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ঘটনা-পরম্পরার কার্যকারণ সূত্র বোঝার জন্য তা বিশেষ সহায়ক : '১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃণ্ময় গৃহ। মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পালাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে; শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুকুর।'

শুধু স্বল্পবিত্ত জনগোষ্ঠী নয়, অনেক বিত্তবান পরিবারও ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। বঙ্কিমের লেখায় তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়: 'এক বৃহৎ অট্টালিকা– তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায়– সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। ... তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার। অন্ধকারে নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।'

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নিয়ে 'কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচিত হয়নি'– এ রকম মন্তব্য করেছেন সুব্রত রায়চৌধুরী তার 'কথাসাহিত্য মন্বন্তরের দিনগুলিতে'। যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায় তা হান্টার সাহেবের লেখা থেকে। 'দ্য এনালস্ অব রুরাল বেঙ্গল' গ্রন্থে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের (খরা/ অনাবৃষ্টিতে ফসলহানি) কারণে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। হান্টার লিখেছেন, "The famine of 1770 was therefore a one year's famine, caused by the general failure of the December harvest in 1769, and intensified by a partial failure of the crops of the previous year and the following spring" এর থেকে আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কৃষক-অর্থনীতিতে প্রবল ধস নেমে আসার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। হান্টার আরও জানিয়েছেন যে, দুর্ভিক্ষের পরের বছর প্রকৃতি মুখ তুলে তাকালেন। বর্ষা হয়ে মাটি আবারও উর্বর হওয়ার সুযোগ পেল। কিন্তু মানুষের দুর্গতি গেল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস পর্যন্ত উপলব্ধি করলেন যে, চাষাবাদ করার মতো যথেষ্ট লোকবল বাংলায় আর অবশিষ্ট নেই। হান্টারের গণনামতে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে 'কৃষকদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের' প্রাণহানি হয়েছিল। শহর এলাকার ডি-ইন্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেশনের পাশাপাশি গ্রাম এলাকার ডি-পপুলেশনের অভিঘাত এসে পড়েছিল বাংলাদেশে। ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট মোগল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার 'দেওয়ানি' লাভ করে। দেওয়ানি অর্থাৎ খাজনার টাকা আদায় করার অধিকার লাভ করে। লক্ষণীয়, দেওয়ানি লাভের পাঁচ বছরের মাথাতেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো এক অদৃষ্টপূর্ব সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ বাংলায় নেমে আসে। এতে ইংরেজ শাসকবর্গের সুশাসনের গুণাবলির পরিচয় পাওয়া যায় না। যে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, সে দেশে রাজ্য শাসনের নৈতিক অধিকার থাকে না– সে কথা বঙ্কিম জানতেন। সেটা ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই তিনি 'আনন্দমঠ' লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন– এমনটা ভাবাও অবাস্তব নয়। মুখে যদিও তিনি বলেছেন, 'ইংরেজকে রাজা করিব'। কিন্তু আমার ধারণা, তার উদ্দেশ্য অন্তর্ঘাতমূলক। তিনি আসলে দেখাতে চান, কোম্পানির হাতে শাসনভার চলে যাওয়ার কারণেই ছিয়াত্তরের মতো এত বড়

মন্বন্তর হতে পেরেছিল। ১৭০০ থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত নবাবি আমলে কৃষি ব্যবস্থার ক্রমান্বয়ে অবনতির চিত্র পরিলক্ষিত হলেও সে সময়ে বাংলায় কোনো দুর্ভিক্ষ হয়নি। তখন চরম দারিদ্র্যের প্রকোপ ছিল; সময় সময় বাংলাদেশ উপোসী থাকত, কিন্তু মন্বন্তর ছিল না। হান্টারের বর্ণনা অনুসরণ করেই তিনি ইংরেজ শাসনকে পরোক্ষে সমালোচনা করেছেন। বঙ্কিম লিখেছেন– '১১৭৪ সালে ফসল ভালো হয় নাই। সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল– লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল... অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে-কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না। মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহির জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তারপর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল,তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।'

বস্তুত বঙ্কিমের বর্ণনায় শুধু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা ছিল না, অধিকন্তু ছিল সাধারণ মানুষ যখন উপবাসে কষ্ট পাচ্ছে, তখন রাজশক্তি (প্রকারান্তরে ব্রিটিশ শাসন) 'রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায়' বুঝে নিচ্ছে; যখন অনাবৃষ্টিতে সামান্যই ফলন হয়েছে, তখন রাজশক্তি সিপাহিদের তথা সামরিক বাহিনীর জন্য সেই ফসল কিনে রাখছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে; এমনকি যখন লোকজন দুই বেলা করে উপবাস করছে, তখনও 'রাজস্ব আদায়' বন্ধ হয়নি। যাতে কোম্পানির মোট রাজস্ব আদায়ে যাতে টান না পড়ে সেজন্য উপবাসের বছরে রাজস্বের মাত্রা 'শতকরা দশ টাকা' হারে বৃদ্ধি করা হলো। স্পষ্টতই এখানে জোর দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও অপশাসনের ওপরে, যা প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত দুঃখভোগকে বহু গুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এটা প্রথমত।

দ্বিতীয়ত, খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের বছরে অন্যায় রাজস্ব আদায়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ছাড়াও বঙ্কিম দুর্ভিক্ষের আরও একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, যা পরবর্তী সময়ে দুর্ভিক্ষের ছায়াসঙ্গী হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সেটি হচ্ছে জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গ। বঙ্কিম লিখছেন :

'খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাওঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষত: বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না, মরিলেও কেহ ফেলে না।'

সুবিদিত যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সেপাইদের জন্য ১৭৬৪ সালেই একটি 'মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৭৮৫ সালে সরকারিভাবে বেঙ্গল, মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে আলাদা 'মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট'-এর প্রবর্তন হয়। কিন্তু তার কার্যপরিধি সীমিত ছিল প্রশাসনিক কর্মচারী ও সামরিক বাহিনীর মধ্যেই। এদেশবাসীর জন্য জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার কোনো অস্তিত্ব

তখন পর্যন্ত ছিল না। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের পর যখন কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে, তখন (১৮৬৯ সালে) সর্বপ্রথম 'পাবলিক হেলথ্ কমিশনার' পদ সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও জনসংখ্যার 'ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স' সংগ্রহ হওয়া শুরু হতে থাকে, যদিও এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয় কেবল ১৯১৯ সালের পরেই। মন্টেগু-চেমসফোর্ডের সাংবিধানিক সংস্কারের অধীনে প্রদেশগুলোর হাতে জনস্বাস্থ্য ও স্যানিটেশনের দায়দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়। আমি বলতে চাইছি, শুধু ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নয়, উনিশ শতক জুড়েই পর্যায়ক্রমে যে দুর্ভিক্ষগুলো ভারতবর্ষে (ও বাংলাদেশে) সংঘটিত হচ্ছিল, তাতে জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা বা বিধিমালা কার্যত ছিল না। বাংলার গ্রাম এলাকা এসব স্বাস্থ্যবিধির সম্পূর্ণ বাইরে থেকে গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে রোগ-মহামারী ইত্যাদি উপসর্গে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বঙ্কিম প্রকারান্তরে জনস্বাস্থ্যের নিদারুণ অভাব বা অনুপস্থিতির কথাই পাঠককে (ও শাসকশ্রেণিকে) স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

তৃতীয়ত, হান্টারের বিবরণী থেকেও জানা যায়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সামাজিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মারাত্মক। ক্যানিবালিজমের উল্লেখ রয়েছে তার লেখায়। হান্টার লিখেছেন, 'All through the stifling summer of 1770 the people went on dying. The husband-men sold their cattle; they sold their implements of agriculture; they devoured their seed-grain; they sold their sons and daughters, till no buyer of children could be found;... in June 1770, the resident at the Durbar affirmed that the living were feeding on the dead.'

বঙ্কিম এক পর্যায়ে হান্টারের বিবরণী অনুসরণ করে জনদুর্গতির মর্মস্পশী বিবরণ দিয়েছেন! 'লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। তারপর কে ভিক্ষা দেয়! উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপর রোগাক্রান্ত হইতে লাগল, গরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল, জোতজমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়।'

আনন্দমঠের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি সরাসরি নরমাংস ভক্ষণের দৃশ্যও প্রোথিত করেছেন। ধনী লোক মহেন্দ্র। কিন্তু তখন 'ধনী নির্ধনের এক দর।' মহেন্দ্র তার স্ত্রী কল্যাণীকে গৃহে রেখে তার শিশুকন্যার জন্য দুধ আনতে গেছেন। এরই মধ্যে তার গৃহে ঢুকে পড়েছে দস্যুর দল। 'মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়। কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক। শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল।' তারা কল্যাণী ও তার শিশুকন্যাকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর বঙ্কিমের প্রায় চাক্ষুষ বর্ণনাতেই শুনুন :

"তখন আর একজন বলিল, 'রাখ, রও, রও, যদি মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে। তবে এই বুড়ার শুক্‌ন মাংস কেন খাই? আজ যাহা লুঠিয়া আনিয়াছি, তাহাই খাইব, এস, ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।' আর একজন বলিল, 'যাহা হয় পোড়া বাপু। আর ক্ষুধা সয় না।' ... অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তু মাত্র।"

চতুর্থত, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে শুধু অর্ধেক কৃষিজীবী জনগণের প্রাণনাশ ঘটে, তাই নয়। এর সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সারা বাংলায়। ডি-পপুলেশনের কারণে কৃষি-ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। হালচাষ করার মতো জনবলও ছিল না। বঙ্কিম লিখেছেন– 'গ্রামে গ্রামে শত

শত উর্ব্বরা ভূমিখণ্ড সকল অকর্ষিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল অথবা জঙ্গলে পুরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলেপূর্ণ হইল। বাংলায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই; বিক্রেয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই; চাষায় চাষ করে, টাকা পায় না, জমীদারের খাজনা দিতে পারে না জমীদারেরা রাজার খাজনা দিতে পারে না। রাজা জমীদারী কাড়িয়া লওয়ায় জমীদার সম্প্রদায় সর্বহৃত হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহার পায় কাড়িয়া খায়।'

এ রকম অরাজক পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ব্যবস্থার পত্তন হয় ১৭৯৩ সালে। তার এক বছর আগে, ১৭৯২ সালে দারোগা ব্যবস্থার পত্তন হয় গ্রাম-এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। এ দেশের কৃষিতে 'পুঁজিবাদী' আদলের খামার-ব্যবস্থা নয়, ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ-উত্তর অরাজক রাজস্ব পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে একটি স্থিতিশীল ঔপনিবেশিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিণত করাই ছিল এর আশু লক্ষ্য।

৪। ১৮৭০-৮০ দশকের 'উপোসি' বাংলা

আগেই বলেছি, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়ায় ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এসেছিল। তাতে করে সাময়িকভাবে হলেও কৃষিতে এক ধরনের স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়েছিল। মন্বন্তরের ফলে লোকশূন্য হয়ে জঙ্গলে পরিণত হওয়া জমি আবার ধীরে ধীরে আবাদযোগ্য জমিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। কিন্তু ১৭৯৩ থেকে ১৮৯৩ এই একশ বছরে সামগ্রিকভাবে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত জমিদারি ব্যবস্থায় বাংলার কৃষকের আর্থিক অবস্থার খুব সামান্যই উন্নতি হতে পেরেছিল। বস্তুত ১৮৫০ সালের পর থেকে, কৃষকের অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটতে থাকে। ১৮৬৮ সালের হান্টারের 'এনালস অব রুরাল বেঙ্গল'-এর পরপর দুটি লেখা প্রকাশিত হয় যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একটি হচ্ছে, ১৮৭২ সালে লেখা বঙ্কিমের 'বঙ্গদেশের কৃষক' এবং আরেকটি হচ্ছে ১৮৭৫ সালের প্রকাশিত রমেশচন্দ্র দত্তের প্রথম বই 'দ্য পেজেন্ট্রি অব বেঙ্গল'। অবশ্য সত্যের খাতিরে বলা দরকার যে, এই তিনটি বইয়ের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না বঙ্কিমচন্দ্রের ভাই সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গল রায়তস: দেয়ার রাইটস অ্যান্ড লায়াবিলিটিস' শীর্ষক ১৮৬৪ সালের 'ট্রিটিস'টি। অর্থনৈতিক চিন্তার ধ্রুপদী গ্রন্থ এটি। কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত জমিদারি ব্যবস্থায় আপাতদৃষ্টিতে দেশের অবকাঠামোগত উন্নতি হচ্ছিল বটে, কিন্তু রায়ত বা চাষিদের জীবনে কোনো শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি। অথচ বাংলার কৃষককুলই তো ছিল জনসংখ্যার শতকরা ৯৯ ভাগ। আজকের যুগে অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের সময়ে 'শতকরা ১ ভাগ বনাম শতকরা ৯৯ ভাগের' বৈষম্য নিয়ে যে কথা আমরা শুনেছি, তারই পূর্বলেখ যেন পাই বঙ্কিম-রমেশচন্দ্র দত্তের লেখায়। বঙ্কিম তার প্রবন্ধে স্মরণীয় করে বলছেন : 'ইংরাজের শাসন কৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে। ... দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ-দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।' দেশের গড় শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, কিন্তু কৃষকের কাছে সেই শ্রীবৃদ্ধির সুফল পৌঁছায়নি। এরপর বঙ্কিম আসল কথাটা পাড়লেন: 'আমরা দেখলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের

তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে আমি কাহারও জয়গান করিব না।' অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনকারীরা জানলে খুশি হতেন যে তাদের আন্দোলনের দেড়শো বছর আগেই বাঙালি এক লেখক ৯৯ শতাংশের শ্রীবৃদ্ধি না ঘটলে সেই জাতীয় 'উন্নয়নকে' প্রগতি বলে সাধুবাদ জানাতে অস্বীকার করেছিলেন।

বঙ্কিম যখন থেকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি প্রকাশ করছেন তখন থেকেই তার সঙ্গে অর্থনীতিবিদ-ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। বিকেলে আড্ডা দিতে দিতে তারা দু'জনে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। বিশেষত তারা উদ্বিগ্ন ছিলেন বাংলার কৃষকের ক্রমঅবনতিশীল অবস্থা নিয়ে। এ কারণেই সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র দত্ত উভয়েরই কৃষক বিষয়ক লেখায় জমিদারবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে অদ্ভুত মিল দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরনের লেখার ওপরে সমসাময়িক ঘটনাবলিও প্রভাব ফেলেছিল। ১৮৬৬ সালের উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ এবং ১৮৭৩ সালে পাবনা ও রংপুরের কৃষকদের বিদ্রোহ নতুন করে কৃষকদের প্রশ্নটিকে সামনে এনে দিয়েছিল। বঙ্কিম লিখেছিলেন, 'জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য, বাঙালি কৃষকের শত্রু বাঙালি ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমিদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।' সঞ্জীবচন্দ্র তার 'বেঙ্গল রায়তস্' গ্রন্থে রায়তের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : 'লর্ড বেন্টিক বলেছেন রায়ত শব্দটির দ্বারা সমগ্র কৃষি জনগোষ্ঠীকেই বোঝানো হয়ে থাকে। ... তবে সাধারণ মতে 'রায়ত' এক নির্দিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীকেই নির্দেশ করে।' যেমন জমিদার সরকারের কাছ থেকে জমি পেয়েছে; তালুকদার জমিদারের কাছ থেকে বড় আকারের জমি পেয়েছে; আর রায়ত জমিদারের কাছ থেকে ছোট আকারের জমি পেয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্ত তার বইটিতে দেখালেন যে, ১৮৫৯ সালের জমিদারি ব্যবস্থা সংস্কার-আইনে তিন ধরনের রায়তের অস্তিত্ব রেখে দেওয়া হয়েছে: (ক) যারা স্থায়ীভাবে জমিদারের জমি চাষাবাদের অধিকার পেয়েছে, অর্থাৎ যাদের জমিদাররা ইচ্ছা করলেই উচ্ছেদ করতে পারবে না; (খ) যারা কেবল ১২ বছরের জন্য চাষাবাদের অধিকার পেয়েছে (এর পরে তারা ওই জমি চাষ করতে পারবে কিনা তা জমিদারের ইচ্ছাধীন) এবং (গ) যাদের জন্য চাষাবাদের ক্ষেত্রে রায়তী অধিকার নির্দিষ্ট করা নেই। এই শেষোক্ত 'আন্ডার-রায়তরাই' ছিল সংখ্যাধিক্যে; এদের যখন-তখন জমি থেকে উচ্ছেদ করা যেতে পারত এবং এদের থেকে ইচ্ছামতো খাজনাও আদায় করা যেত। রমেশচন্দ্রের 'দ্য পেজেন্ট্রি অব বেঙ্গল' লেখার প্রধান প্রেরণা ছিল এই তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত অধিকারবিহীন রায়ত বা কৃষকদের জন্য 'চিরস্থায়ী আবাদের' অধিকার আদায় করা। অর্থাৎ, এদেরও প্রথম গ্রুপের তালিকাভুক্ত করানো। এর জন্যই তিনি নানাবিধ তর্কের জাল বিস্তার করেছিলেন বইটিতে। এক্ষেত্রে তার অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল যে, এই অধিকারহীন তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত রায়তেরাই বাংলার কৃষিতে পূর্বাপর চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, এরাই পর্বান্তরে দুর্ভিক্ষের শিকার হচ্ছে বা দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে থেকে যাচ্ছে।

১৮৭০-র দশকে শুধু যে পাবনা-রংপুরের কৃষকরা স্থানীয়ভাবে বিদ্রোহ করছিল তাই নয়, সে সময় এলাকা বিশেষে খাদ্যাভাবও দেখা দিচ্ছিল। এমনকি বাংলার 'শস্যভাণ্ডার' বলে পরিচিত পূর্ববঙ্গের খাদ্য-উৎপাদনে 'উদ্বৃত্ত' জেলাগুলোতেও ক্ষুধার প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছিল। ১৮৭০-র পর থেকেই বাংলা সামগ্রিকভাবে হয়ে ওঠে 'উপোসি বাংলা'। বঙ্কিম-রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের লেখায় কৃষকদের দুর্দশার যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে অবশ্য খাদ্যাভাব, মৌসুমি খাদ্য ঘাটতি ও অনাহারে থাকার বিশদ উল্লেখ নেই। ক্ষুধার বিস্তৃতির পেছনে যেমন ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজনিত 'কাঠামোগত' কারণ, তেমনি এর মধ্যে

ক্রিয়াশীল ছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘন ঘন বন্যা ও অনাবৃষ্টির প্রাদুর্ভাব। শেষোক্ত প্রবণতাটি শুধু বাংলায় নয়, ভারতবর্ষ ও তার বাইরের বৃহত্তর এশিয়া-আফ্রিকার উপনিবেশগুলোতেই পরিদৃষ্ট হয়। মাইক ডেভিস জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষকে 'ভিক্টোরিয়ান হলোকাস্ট' বলে অভিহিত করেন। কৃষির ঔপনিবেশিক কাঠামোগত সংকটের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ অনিশ্চয়তা মিশে গিয়ে খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষকে প্রায় অনিবার্য করে তুলেছিল। ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রকে এই সময়ে বিশেষভাবে ব্যতিব্যস্ত থাকতে দেখা যায় সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ-নিবারণী কর্মকাণ্ডের আলোচনায়। রমেশচন্দ্র দত্তের 'দ্য পেজেন্ট্রি অব বেঙ্গল' প্রকাশের পাঁচ বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয় (১৮৮০ সালে) 'রিপোর্ট অব দ্য ইন্ডিয়ান ফেমিন কমিশন'। ঔপনিবেশিক শাসনের অফিসিয়াল ডিসকোর্সের অংশ হয়ে দাঁড়ায় দুর্ভিক্ষ-বিষয়ক ডিসকোর্স।

বাংলার প্রকট খাদ্যঘাটতি ও গণ-ক্ষুধার প্রভাব পূর্ববঙ্গের জেলাগুলোয় আদৌ পড়েছিল কিনা এ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ একথা দাবি করেছেন যে, বিশ শতকের আগে এখনকার বাংলাদেশ ভূখণ্ডের জেলাগুলোতে 'দুর্ভিক্ষ' দেখা দেয়নি। উনিশ শতকের দুর্ভিক্ষগুলো হয়েছে বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি মহাফেজখানার তথ্য-উপাত্ত বিচার করে আমার মনে হয়েছে যে, বড় আকারের দুর্ভিক্ষ উনিশ শতকের পূর্ব বাংলায় সংঘটিত না হলেও বিস্তৃত ক্ষুধার (স্টারভেশনের) দীর্ঘমেয়াদি অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় পূর্ববঙ্গের জেলাগুলোতেও। অর্থাৎ, শুধু চরম দারিদ্র্য নয়, ব্যাপক অনাহার বিরাজ করছিল এসব জেলায়, এমনকি অপেক্ষাকৃত খাদ্যে-উদ্বৃত্ত এলাকাগুলোতেও। ১৮৭০-৮০-এর দশকের স্থানীয় পত্রপত্রিকাতে সেসব ক্ষুধা-অনাহারের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে ক্ষুধায় বা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে অসুখে প্রাণহানির সংবাদও। সেগুলো জাতীয় পর্যায়ে হেডলাইন করা সংবাদ ছিল না ঠিকই, কিন্তু এর মধ্য থেকে যে চিত্র ফুটে ওঠে তা খাদ্য-নিরাপত্তার স্বস্তিকর চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেসব বিবরণ পড়লে মনে হয় শুধু দারিদ্র্যে নয়, সময় সময় ক্ষুধায় কাটাতে হতো বৃহত্তর কৃষি-নির্ভর জনগোষ্ঠীকে এবং সে জনগোষ্ঠীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ 'দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে' থাকতো বছরের অধিকাংশ সময়। এই গবেষণার কাজে আমাকে সাহায্য করেছিলেন ইতিহাসের তরুণ গবেষক ইফাত আরা বিথী ও নবেন্দু সরকার। তাদের সহায়তায় আর্কাইভ থেকে যেসব তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে, তারই অংশবিশেষ ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে এখানে তুলে ধরা হলো।

(১) ১৮৭৮ সালে 'হিন্দু হিতৈষিণী' পত্রিকার ২০ জুলাই সংখ্যায় বলা হচ্ছে :'পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে' মধ্যবিত্তের মধ্যে খাদ্যশস্যের ক্রমান্বয়ে মূল্যবৃদ্ধির কারণে দুরবস্থা দেখা দিয়েছে। নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের সংবাদদাতারা এ তথ্য জানাচ্ছে। ... অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে; অনেকেই কয়েক দিন ধরে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন।'

(২) ১৮৭৮ সালের 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার ২১ জুলাই সংখ্যায় বলা হচ্ছে : 'এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ঢাকার কমিশনার সাহেব গত দুর্ভিক্ষের সময়ের উদ্বৃত্ত তহবিল থেকে খাদ্যশস্য কিনে তা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীদের জন্য স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করার প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দিয়েছেন। প্রথমত, আউশ ধান ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না, কেননা এ বছরের আউশ ধানের ফলন ভালো হবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দ্বিতীয়, ফলন যদি মোটামুটিও

হয় তাহলেও সহসা এই শস্যের মূল্য নামতে শুরু করবে না। ততদিনে বর্তমানের দুর্গতি আরো মারাত্মক আকার ধারণ করবে, অনাহারে মৃত্যু ঘটতে পারে কারো কারো, যা এখন আর বিরল ঘটনা নয় এই অঞ্চলে। গত সাত-আট মাস ধরে খুবই চড়া দামে চাল বিক্রি হচ্ছে; খাদ্য কিনতেই মানুষের সব টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। ১৮৭৪ সালের পরিস্থিতির তুলনায় এ বছর অবস্থা আরও খারাপ এ কথা বিবেচনা করে ঢাকাবাসীর জন্য সত্বর খাদ্যশস্য নির্ভর ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।'

(৩) ১৮৭৮ সালের 'ভারত মিহির' পত্রিকার ২৭ জুলাই সংখ্যায় বলা হচ্ছে : 'দুর্ভিক্ষের চিরস্থায়িত্ব আমাদের বিচলিত না করে পারে না। কীভাবে এটি নিবারণ করা যায় এই প্রশ্নটি জনমনে রয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষ নিবারণে যে ব্যয় হবে, সরকারের পক্ষে তা কতদিন বহন করা সম্ভব? ... সরকারী সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও [১৮৭৭ সালের] মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ তো এড়ানো গেল না– তিরিশ লাখ মানুষের মৃত্যু হলো সেখানে। মানুষের মনে ক্রমশ এই ভুল ধারণাই জমাচ্ছে যে, [১৮৭৬ সালের ১লা মে] রানী ভিক্টোরিয়া যখন থেকে ভারত-সম্রাজ্ঞীর শিরোপা পরলেন তখন থেকেই ভারতবর্ষে একের পর এক বিপর্যয় নেমে আসছে।'

(৪) ১৮৭৮ সালের 'হিন্দু রঞ্জিকা' পত্রিকার ১৪ আগস্ট সংখ্যায় বলা হচ্ছে : 'এদেশের ইতিহাসে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ আর কখনো হয়নি... বন্যার ফলে বাংলার শস্য-ভাণ্ডারূপে পরিচিত সিরাজগঞ্জ এবং পাবনার আউশ ও আমন ধান নষ্ট হয়ে গেছে; এর ফলে পুরো প্রদেশেই দুর্ভিক্ষের আশংকা দেখা দিয়েছে। ... বিহারে দুর্ভিক্ষের সময় যেমন সরকারী সিদ্ধান্ত এসেছিল যে যেখানেই চালের দাম মণ প্রতি ৬ টাকায় চলে যাবে, সেখানেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকা ঘোষণা করা হবে। একই ধরনের ঘোষণা এখন বাংলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।'

(৫) ১৮৭৮ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার ৩০ আগস্ট সংখ্যায় বলা হচ্ছে : 'চালের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে করে ধারণা হয় যে দুর্ভিক্ষ আসন্ন। এমন কোন গ্রাম পাওয়া যাবে না যেখানে মণ প্রতি ৪ বা ৫ টাকার নীচে চাল বিক্রি হচ্ছে। এ রকম অবস্থায় ইউরোপে চাল রপ্তানী করা হচ্ছে। চাল রপ্তানীতে আমাদের আপত্তি থাকত না যদি দেশের ভেতরে চালের যথেষ্ট মজুদ থাকত।'

(৬) ১৮৭৮ সালের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার ২০ নভেম্বর সংখ্যায় বলা হচ্ছে : 'কলেরা মারাত্মক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে চন্দননগর শহর ও তার আশে-পাশের গ্রামগুলোয়। একদিনেই মারা গেছে সত্তর জনের মত। ... হুগলি নদীর দু'ধারের গ্রামগুলোতে নানা ধরনের মহামারী প্রকট। প্রতি দিন সেখানে কত জন মারা যাচ্ছে তার কোন হিসাব আমাদের কাছে নেই।' এই ঘটনা চন্দননগর সংলগ্ন গ্রামাঞ্চল নিয়ে হলেও পূর্ব বঙ্গের গ্রাম এলাকাতেও এটা ঘটেছে।

(৭) ১৮৭৮ সালের 'ঢাকা প্রকাশ' ৩রা নভেম্বর সংখ্যায় লিখেছে 'পূর্ব বঙ্গে দুর্ভিক্ষের আশংকার' কথা : 'লর্ড নর্থব্রুক বলেছেন যে-স্থানে চালের দাম মণ প্রতি চার টাকায় পৌঁছাবে সেই এলাকাকেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা। এ রকম অবস্থা দীর্ঘ দিন ধরেই পূর্ব বঙ্গের প্রায় সমগ্র অঞ্চল জুড়েই বিরাজ করছে। ময়মনসিংহে চালের দাম মণ প্রতি ৬-৭ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। ... আমরা অনেক দিন ধরে এসব এলাকার জনদুর্দশা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছি। এক বেলা খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে কাউকে, কেউ বা কিছুই খেতে

পাচ্ছে না। সরকারী কর্মকর্তারা অবশ্য তারপরও ভাবছেন যে জরুরী ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর কোন দরকার নেই। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো, এত চড়া দামে যারা চাল কিনতে পারছে তারা নিশ্চয়ই অবস্থাশালী। আসলে অভাবের কারণে চড়া দরে খাবার কিনতে গিয়ে অধিকাংশ মানুষই তাদের সর্বস্ব হারাতে বসেছে। অন্যদিকে, যারা মৃত্যুর পথে ধুঁকে ধুঁকে চলেছে তাদের প্রতি রাষ্ট্রের কোন মনোযোগ নেই।' মনে হচ্ছে, এই বর্ণনায় উনিশ শতকের 'মরা কার্তিককে' দেখছি।

(৮) ১৮৭৮ সালের 'ভারত মিহির' ৫ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এমনটা লিখেছে : 'পূর্ব বঙ্গের মফস্বল থেকে একের পর এক দুঃসংবাদ আসছে যে, বন্যার কারণে আমন ধান নষ্ট হয়ে গেছে। সর্বত্র চালের দাম মণ প্রতি পাঁচ টাকায় চড়ে গেছে। কেবল মাত্র যারা পাটচাষী তাদের অবস্থা কিছুটা ভাল। তারপরও সামগ্রিক ভাবে দুর্দশার পরিমাণ কম নয়। স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা বিলাসবহুল জীবনে থেকে হয় তারা জনগণের কষ্ট বুঝতে পারছেন না, অথবা তারা প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে চাইছেন না এবং সরকারের কাছে 'অবস্থা সন্তোষজনক' ধরনের প্রতিবেদন পাঠাচ্ছেন। স্যার এশলি এডেন গরীব মানুষের বান্ধব রূপে পরিচিত, কিন্তু তার গৃহীত পদক্ষেপগুলো সে কথা বলছে না। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট আর কমিশনারদের প্রতিবেদন পেয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকছেন। কিন্তু তাকেই বা দোষারোপ করি কেন? এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করা কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব? স্থায়ী ভাবে রিলিফের কাজ সর্বত্র করানো যাচ্ছে না, এর সহজ ব্যাখ্যা হলো– এর জন্যে সরকারী তহবিল অপ্রতুল।' কেননা সরকারি ব্যয়ের বড় অংশই চলে যাচ্ছে অন্যান্য খাতে, যেমন কাবুল-যুদ্ধে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৭৮-৮০ সাল পর্বে ২য় 'এংলো-আফগান ওয়ার' চলছিল, যার বাবদ অনেক খরচ বেড়ে গিয়েছিল ঔপনিবেশিক সরকারের। এই খরচের সিংহভাগ যুগিয়েছিল ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের শিকার ভারতবর্ষের তথা বাংলার কৃষক-সম্প্রদায়।

(৯) ১৮৭৮ সালের ২২শে নভেম্বরের 'ঢাকা প্রকাশ' জানাচ্ছে : 'চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে চালের দাম কমা শুরু করলেও ঢাকা ও তার আশে-পাশের এলাকায় চাল মণ প্রতি ৭-৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ঢাকার আমন ধান বন্যার কারণে সম্পূর্ণ বিনষ্ট। মুন্সীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ এলাকার ধানে পোকার কামড় দেখা দিয়েছে, ফলে সেখানেও ভাল ফসল হওয়ার সম্ভাবনা কম। এসব বলে ঢাকা প্রকাশ যোগ করেছে, 'আমরা এমনকি অনাহারে মৃত্যুর খবরও পেয়েছি' ('We have heard even of deaths from starvation')।

(১০) ১৮৭৮ সালের ১৮ই নভেম্বর 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা খবর দেয় যে, বাগেরহাটের লোকজন স্থানীয় বোরো ধানের ফলন নষ্ট হওয়ায় 'দুর্ভিক্ষের অবস্থায় উপনীত' হয়েছে। তারপরও তাদের ওপরে বকেয়া দায়-দেনা পরিশোধের জন্য মহাজনদের কাছ থেকে নানারকমের অত্যাচার নেমে এসেছে। 'সোমপ্রকাশ' আরও জানিয়েছে যে, 'নিম্নবর্ণের একটি নারী ক্ষুধার জ্বালায় স্থানীয় হাটবাজারে গিয়ে তার শিশুকন্যাকে ১২ আনার বিনিময়ে বিক্রি করে দিতে চেয়েছে।'

১৮৭৮ সালের যে-দশটি বিবরণী উপরে পেশ করা হলো তাতে করে মনে হতে পারে, বুঝি ঐ বছরেই দুর্ভিক্ষের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ। এর প্রায় এক বছর পরেও

দেখি, অবস্থার কোনো উন্নতি তো হয়ই নি, বরং লক্ষণীয় অবনতি ঘটেছে। যেমন, ১৮৭৯ সালের ৩০শে জুলাই মাসের হিন্দু রঞ্জিকা পত্রিকা সিরাজগঞ্জ-শাজাদপুর এলাকায় দুর্ভিক্ষ ঘনিয়ে আসতে দেখেছেন : 'অনেক মানুষ সেখানে গাছের পাতা খেয়ে থাকছে। বাকিরা ভিক্ষের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে।' ঐ একই বছরের ২২শে আগস্টের 'প্রভাতী' পত্রিকা লিখেছে, 'চালের দাম যে-হারে বাড়ছে তাতে করে দুর্দশা বাড়ছে এবং সেটা যদি চলতে থাকে অচিরেই দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে। এটা থামানো যেতে পারে কেবল মাত্র মুক্ত বাণিজ্য নীতির বিষয়ে কিছুটা হস্তক্ষেপ করেই। এদেশ থেকে যাতে চাল বাইরে রপ্তানি না হয়ে যায় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।' পরবর্তীতে, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর আলোচনার সময়েও দেখতে পাব যে চালের রপ্তানি বন্ধের দাবি নতুন করে উঠেছিল।

উপোসি বাংলা তথা পূর্ব বাংলার 'নীরব অনাহারের' যে চিত্র আমি দেখাতে সচেষ্ট হয়েছি তা ১৮৭০-৮০র দশকের কোনো কথাসাহিত্যে লিপিবদ্ধ হয়নি। রমেশচন্দ্র দত্ত বা বঙ্কিমের প্রবন্ধ-সাহিত্যে ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ এসেছে কৃষক-জমিদার বৈরী সম্পর্কের আলোচনার অনুষঙ্গ হিসেবে। সরাসরিভাবে দুর্ভিক্ষের চিত্র সেসময়ের কথা-সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া কঠিন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের প্রসঙ্গ যেভাবে সমসাময়িক কথাসাহিত্যে প্রায়-অনুপস্থিত, ১৮৬০-১৯০০ সাল অবধি বাংলার চরম খাদ্যাভাব, মৌসুমী ক্ষুধা ও সময় সময় প্রায় দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি নিয়ে অনুরূপ নীরবতা দৃশ্যমান। সমসাময়িক পত্র-সাহিত্যেও ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিরিশ পেরুনো রবীন্দ্রনাথ যখন অবিস্মরণীয় 'ছিন্নপত্র' লিখছেন তখন তার মধ্যে বাংলার মায়াময় প্রকৃতির ছবি ফুটে উঠেছে, কিন্তু ক্ষুধা ও অনাহারের বিস্তৃতি কোথাও দেখি না। শুধুমাত্র সমসাময়িক পত্রিকা সাময়িকী বিশেষত স্থানীয় পর্যায়ে প্রকাশিত বাংলার নানা পত্রপত্রিকা নিজেদের সাধ্যমতো দুর্ভিক্ষের আশংকার কথা জোরেসোরে তুলে ধরেছে। তাতে প্রেরণা এসেছে নানা সূত্র থেকে। 'আঙ্কল টমস কেবিন' উপন্যাসটির উদাহরণ এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। ১৮৫২ সালে প্রকাশিত দাস-প্রথা বিরোধী এই উপন্যাসটি পঞ্চাশের দশকের প্রাগ্রসর বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছিল। 'দ্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-র বরাত দিয়ে নরহরি কবিরাজ জানাচ্ছেন যে, এরা মনে করতেন আমেরিকার দাসদের মতোই মানবেতর জীবনের পর্যায়ে নেমে গেছে বাংলার চাষীদের জীবন। এরা তাই ঠিক করলেন যে, 'বাংলার রায়তদের সামাজিক অবস্থা' নিয়ে রচনা-প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন। এতে যিনি সেরা রচনাটি লিখবেন তিনি পাবেন পাঁচশত টাকা পুরস্কার। এর বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন সেকালের উদারনৈতিক তিন ব্যক্তিত্ব : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরী চাঁদ মিত্র এবং রেভারেন্ড জেমস লং। ১৮৫৫ সালে প্যাট্রিয়ট আরও আশা করেছিল যে, রায়তদের অবস্থা নিয়ে 'যদি কোনো উপন্যাস অদূর ভবিষ্যতে লিখিত হয়, সে লেখার মান ডিকেন্স অবধি না গড়ালেও' তা একটি বড় কাজ হবে এবং এর মধ্য দিয়ে জমিদারী ব্যবস্থার মাধ্যমে চলতে থাকা 'নানা জঘন্য কাজ জনসাধারণ্যে পৌঁছাবে।' দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ বা মীর মশররফ হোসেনের জমিদার দর্পণ-এর মধ্য দিয়ে 'প্যাট্রিয়ট'-এর সেই আশা সেভাবে পূর্ণ হয়নি।

১৮৭০ দশকের উপোসি বাংলার দুঃখ-দুর্দশা ১৮৮০-৯০ দশক জুড়েই অব্যাহত ছিল। ১৮৯২ সালের 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে ভূদেব মুখোপাধ্যায় পরিসংখ্যান-সারণি ব্যবহার করে এ বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন। পারিবারিক ও ধর্মীয় বিষয়ে ভূদেব যতটাই প্রাচীনপন্থী ছিলেন, অর্থনৈতিক বিষয়ে তিনি ছিলেন ততটাই আধুনিকপন্থী। যারা তার 'আর্থিক অবস্থা বিষয়ক' ভবিষ্যবিচার পড়বেন, তারাই বিস্মিত হবেন তার অর্থনৈতিক চিন্তার প্রাজ্ঞতা ও স্বচ্ছতার পরিচয় পেয়ে। ভূদেবের চিন্তার এই

দিকটি পৃথক অভিনিবেশের দাবী রাখে। আপাতত এটা দেখানো জরুরি যে, ১৮৯০ দশকের পটভূমিতে অর্থাৎ উনিশ শতক যখন শেষ হয়ে আসছে– ভূদেব দুর্ভিক্ষ বিষয়ে কী বলছেন:

'পণ্ডিতেরা গণনা করিয়াছেন যে, ৫ কোটি ভারতবাসীর পক্ষে পর্যাপ্ত অন্ন দুই সন্ধ্যা জুটে না! কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, অনাহার, অল্পাহার এবং কদাহার দোষে ভারতবাসী ক্ষীণবীর্য্য এবং স্বল্পায়ু হইতেছে। একপ্রকার নিশ্চয় হইয়াই গিয়াছে যে, প্রতি দশ এগার বৎসর অন্তর ভারতবর্ষে একটি করিয়া বৃহৎ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এবং তাহার পরেই একটী করিয়া মহামারী আসিয়া উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন, স্থানে স্থানে অন্নকষ্ট এবং মারীভয় প্রায় প্রতিবর্ষেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রভূত ধনশালী ইউরোপের কথা ছাড়িয়া দিলেও পৃথিবীর অপর কোন দেশের অবস্থা এরূপ হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না।'

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতকে হাল্কা করে দেখার উপায় নেই। তার 'সামাজিক প্রবন্ধ' প্রকাশের পর এশিয়াটিক সোসাইটির আলোচনা সভায় স্যার চার্লস এলিয়ট এরকম মন্তব্য করেছিলেন যে, ভূদেবের মতো 'এত বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ভারতে আর কেউ নেই।' এ কথা ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরী তার 'ইউরোপ পুনর্দর্শন' গ্রন্থে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

উপোসি বাংলা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও স্থানীয় পত্রপত্রিকার উদাহরণ টেনে আমি এ পর্যন্ত দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, উনিশ শতকের বাংলার বৃহত্তর গ্রামীণ কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠী তথা রায়তদের মধ্যে ক্ষুধার ব্যাপক বিস্তৃতি হয়েছিল। এর প্রভাব থেকে অপেক্ষাকৃত খাদ্যে উদ্বৃত্ত জেলাগুলোও বাদ ছিল না। পূর্ব বঙ্গের নানা জেলাতেই কখনো বন্যার কারণে, কখনো অনাবৃষ্টির কারণে ফসল হানি হয়েছে, কিন্তু জমিদারের শোষণের মাত্রা কমেনি–১৮৫৯ সালের বর্গা-স্বত্ব আইনের সংস্কার প্রচেষ্টার পরেও। গ্রামাঞ্চলে রায়তী অধিকারবিহীন (যাদেরকে under-ryot বলা হয়েছে) এক নিম্নতম বর্গের সৃষ্টি হয়েছিল, যারা নেমে গিয়েছিল দারিদ্র্যসীমার অনেক নিচে, দারিদ্র্য আর ক্ষুধার মধ্যবর্তী পর্যায়ে। এরাই ছিল উনিশ শতকের বাংলার প্রান্তিক মানুষ। ফসলহানির বছরে এরাই চলে যেত দুর্ভিক্ষাবস্থায় বা থাকত দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে। আমি মাঝে মাঝে সন্দেহ করি যে, এক নীরব ক্ষুধা-অনাহারের বেদনা মিশে আছে উনিশ শতকীয় বাংলার 'বাউলা' গানে-কবিতায়। এই পৃথিবীবিমুখতা, জগৎ-সংসার ছেড়ে অচিনপুরের চিন্তা, এর পেছনে হয়ত গ্রামের নিম্নতম বর্গের সামাজিক-অর্থনৈতিক কষ্ট-বঞ্চনার অগ্রন্থিত অভিজ্ঞতা কাজ করে থাকবে। অথবা, গ্রাম-বাংলার বুক থেকে উঠে আসা এই বেদনার্ত লোকজ গানগুলো ছিল ক্ষুধাপীড়িত গ্রামীণ জনজীবনেরই শুদ্ধতম শিল্পরূপ।

৫। পঞ্চাশের মন্বন্তর

এলা সেনের ছোটগল্প সংকলন 'ডার্কেনিং ডেইস' (Darkening Days) বেরিয়েছিল ১৯৪৪ সালের মে মাসে। ইংরেজিতে লেখা নয়টি গল্প ছিল তাতে। বইটির দুটি বিশেষত্ব প্রথমেই চোখে পড়বে। প্রথমত, গল্পগুলো লেখা 'নারীর দৃষ্টিকোণ' থেকে। কথাটা আজকের দিনে আর তেমন নতুন মনে হবে না। কিন্তু গ্রন্থ রচনার কাল ১৯৪৩-৪৪ সালে সেটা মনে রাখলে কিছুটা বিস্মিত হতেই হয়। গ্রন্থকার বলছেন : 'this book is admittedly written from a woman's point of view, if on this account over-emphasis is laid on the vicissitudes of women during the dreadful days of last year it is not for want of appreciation of the sufferings of men' ইংরেজি ১৯৪৩ সালের (বাংলায় যা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত) এক বছর বাদে প্রকাশিত বইটির ভূমিকায়

লেখিকা বলছেন : 'দুর্ভিক্ষ এখনও কেটে যায়নি।... মহামারী এখন গ্রামের পর গ্রামে মাথা তুলছে এবং এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসা সাহায্য পৌঁছায়নি। অধিকাংশই বোঝে না পুনর্বাসনের মানে কী... উটপাখির মতো মাথা গুঁজে বসে থাকলে সমাধান মিলবে না... এই বইতে আমি বলার চেষ্টা করেছি যে বড় আকারের ত্রাণ তৎপরতা হাতে নেওয়া প্রয়োজন, যদি বাংলাকে পুনর্জীবিত করতে হয়।... সরকার কি করবে বা করবে না, বা করতে পারবে না, তার জন্য বসে না থেকে অ-সরকারি ত্রাণকার্য চালিয়ে যেতে হবে।... লক্ষ্মী, যুথিকা বা সুখীর দুঃখ-যন্ত্রণাকে বৃথা যেতে দেওয়া যাবে না।'

এলা সেনের বইটির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জয়নুল আবেদিন। দুর্ভিক্ষের যে-চিত্রকর্মগুলোর জন্য তরুণ জয়নুল (তাঁর তখন ঊনত্রিশ বছর বয়স) রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন সেই ছবিগুলো দিয়ে সাজানো বইটি। হলদে কাগজের ওপরে কালো (চাইনিজ ইংক) কালিতে আঁকা সেসব, প্রতিটিতে ১৯৪৩ সালের উল্লেখ রয়েছে। এলা সেন বইয়ের পরিচিতিপত্রে যোগ করেছেন, 'উইথ ড্রইং ফ্রম লাইফ বাই জয়নুল আবেদিন'। তেরোটি ছবি, এদের বেশির ভাগই এখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। আমার জানা মতে, এলা সেনের বইটিতে জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবিগুলো প্রথম প্রকাশিত হয়। কী করে জয়নুলের সঙ্গে এলা সেনের যোগাযোগ হলো সেটাও আমাদের আগ্রহ জাগায়। কে ছিলেন এই এলা সেন?

এলা সেনের বইটি প্রকাশিত হয়েছিল সুশীল গুপ্ত'র প্রকাশনালয় থেকে। তার মেয়ে লীলা দাস গুপ্ত জানাচ্ছেন, 'এলা সেন ছিলেন সাংবাদিক। তার স্বামী আলেক রেইড কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় কাজ করতেন। খুশওয়ান্ত সিং-এর 'সাহিবস্ হু লাভড্ ইন্ডিয়া' বইটিতে আলেক রেইডের উল্লেখ আছে।' পরবর্তীতে এলা সেন ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং ১৯৭৩ সালে ইন্দিরার প্রথম জীবনীকার ছিলেন তিনিই। নারী অধিকার কর্মী ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য মনিকুন্তলা সেনের বরাত দিয়ে 'ক্যালকাটা : দ্য স্টর্মি ডেকেডস্' গ্রন্থে ইতিহাসবিদ তনিকা সরকার জানাচ্ছেন যে, এলা সেনের কলকাতার বাসায় বামধারার ও প্রগতিশীল মতের নারীরা প্রায়ই মিলিত হতেন। তরুণ জয়নুল আবেদিনও প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এ সময়ে। মকবুল ফিদা হুসেন ও সৈয়দ হাশিম রাজার মতো শিল্পীরা যেমন করে উন্মেষ পর্বেই প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, জয়নুলও তেমনিভাবে সে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই আন্দোলন ও গোষ্ঠী গড়ে তোলার পেছনে প্রত্যক্ষভাবে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল। পার্টির প্রেরণাতেই জয়নুল কলম-তুলি ধরেছিলেন দুর্ভিক্ষের ডকু-বিবরণী রঙে-রেখায় প্রকাশের জন্য। এ কাজে তিনি অবশ্য একা ছিলেন না। তার সঙ্গে ছিলেন শোভা সিং, চিত্তপ্রসাদ, অতুল সুর, গোবর্ধন এষ, সোমনাথ হোর প্রমুখ শিল্পী। এন্ড্রু হোয়াইটহেড মন্তব্য করেছেন, 'স্পষ্টতই জয়নুল ছিলেন বামধারার পক্ষে'। পরবর্তীতে এই 'বামপন্থি' জয়নুল আবেদিন 'বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলার জনক হয়ে ওঠেন'।

কিন্তু এলা সেনের বইটি গল্পগ্রন্থ হলেও সেখানে একটা পরিশিষ্ট ছিল, যাতে পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্পর্কে চলতি তথ্যের বিরল বিচার-বিশ্লেষণ রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনথ্রোপলজি বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত জরিপের উল্লেখ করে সেখানে বলা হয়েছে : ১৯৪৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষে মহামারীতে 'স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পঁয়ত্রিশ লাখের বেশি।' (the probable total number of deaths above the normal comes to well over three and a half millons)। এর মধ্যে ১৯৪৩ সালের মহামারীতে মৃত্যুর সংখ্যা ১৯ লাখে গিয়ে দাঁড়াবে। পরিসংখ্যানকে বিশ্বাসযোগ্য

করে তোলার জন্যই বোধকরি দুই মিলিয়ন নয়, একেবারে গুণে গুণে ১.৯ মিলিয়নের মৃত্যু সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বে উল্লিখিত জরিপের মতে, 'এই মৃত্যুর ৩০ থেকে ৫০ শতাংশই পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু। অমর্ত্য সেনের মতোই লেখিকা এখানে যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, খাদ্যের উৎপাদনে স্বল্পতা নয়, খাদ্যের বণ্টনে বৈষম্য ও অব্যবস্থার কারণেই এই দুর্ভিক্ষ হয়েছে। আমেরিকার 'লাইফ' ম্যাগাজিনের বরাত দিয়ে জানানো হয় যে, 'প্রকৃতপক্ষে [১৯৪৩ সালে] ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৪২ অথবা ১৯৪১ সালের চেয়েও বেশি হয়েছিল। স্থানীয় পর্যায়ে কোথাও কোথাও ঘাটতি অনুভূত হলেও সেটা বড় কারণ ছিল না। মূল কারণ ছিল দুটো। একটি হচ্ছে কেন্দ্রের ব্রিটিশ সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের মধ্যে দায়িত্বশীল সম্পর্কের আংশিক ভেঙ্গে পড়া। আরেকটি হচ্ছে (প্রবল) মূল্যস্ফীতি।'

সম্প্রতিকালে দুটো প্রকাশনা পঞ্চাশের মন্বন্তরের কার্যকারণের ব্যাখ্যায় উল্লেখযোগ্য নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মধুশ্রী মুখার্জি তার দীর্ঘকালের গবেষণা দিয়ে দেখিয়েছেন যে, জাপানি আক্রমণের ঝুঁকির মুখে ব্রিটিশ সরকার বাংলার সব উদ্বৃত্ত চাল মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধরত ইংরেজ সেনাদের জন্য মজুদ করে রেখেছিল। তার ওপরে যাতে করে কোনো চাল বাজার-ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্য কারও হাতে চলে না যায় বা বাংলার বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপান অধিকৃত অঞ্চলে চলে না যায় সেজন্য পূর্ববঙ্গের থেকে চাল রপ্তানিতে ব্যবহৃত পণ্যবাহী ছোট ছোট নৌযান পর্যন্ত ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। সমগ্র ১৯৪৩ সাল জুড়েই কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকা তাদের প্রথম পাতায় তিনটি পরিসংখ্যান বড় করে প্রকাশ করত– 'গতকাল মৃত্যুর সংখ্যা,' 'গত সপ্তাহের মৃত্যুর সংখ্যা' এবং 'গত মাসের মৃত্যুর সংখ্যা'। এই মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে যাচ্ছিল হাজারের এককে। তারপর মৃত্যু এত বেড়ে গেল– এই পরিসংখ্যানের প্রকাশ এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে গেল। তবু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের টনক নড়েনি। বাংলার কৃষককে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিয়ে ইংরেজ সৈন্যদের খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করাই তার কাছে অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। 'চার্চিল'স সিক্রেট ওয়ার' গ্রন্থে সে কথা মধুশ্রী মুখার্জি সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। বাংলার কৃষককূল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে তার নীতির কারণে– এ কথা শোনার পর চার্চিল বলেছিলেন, 'গান্ধী কি বেঁচে আছে এখনও? সে মারা যায় না কেন?'

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের শিকার তিরিশ লাখ মানুষের মৃত্যুর পেছনে চার্চিলের পরোক্ষ ভূমিকায় অনেকেরই কপালে ভাঁজ পড়বে। অনেকেই 'উদারনৈতিক গণতন্ত্রের' সীমা নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়বেন। এদের কারো কারো কাছে চার্চিল অবাধ পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের মানসপুত্রের মতো। তার সুস্বাদু ইতিহাস রচনা (যার জন্য সাহিত্যে নোবেলও পেয়েছিলেন তিনি) অস্বীকার করার নয়। যেমন নয় যুদ্ধকালীন সময়ে ইংলেন্ডের প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তার অনুপ্রাণিত ভাষণ ও নেতৃত্ব। যুদ্ধ জয়ের পর রক্ষণশীল সরকারের পতন হলো এবং তিনি আর প্রধানমন্ত্রী রইলেন না। এতেও দুঃখ প্রকাশ করেন কেউ কেউ। কিন্তু এটাও অস্বীকার করার নয় যে, চার্চিলের মতো 'লিবারেল' রাজনীতিকের সাফল্যের পেছনে রয়েছে অনেক অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি ও অমানবিক নীতি প্রয়োগের ধারাবাহিকতা। ইংলন্ডকে বাঁচানোর জন্য তিনি ভারতবর্ষ বা অন্যান্য উপনিবেশকে দুর্ভিক্ষের গ্রাসে ফেলে দিতে দ্বিধা করেননি। যখন তিনি যুদ্ধোত্তরকালে একনাগাড়ে ছবি এঁকেছেন (এ কাজে দক্ষতা ছিল তার), একবারও আঁকেননি জয়নুলের মতো কোনো দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের ছবি। সেসব নিরন্ন মানুষের চিৎকার তার স্বপ্নের মধ্যে কখনো শোনা যেত কিনা

এ বিবরণ জানা যায় না। ইউরোপের জন্য এক নিয়ম, আর উপনিবেশের মানুষদের বিচার করার ক্ষেত্রে অন্য নিয়ম– পার্থ চ্যাটার্জী যাকে বলেছেন 'কলোনিয়াল রুল অব ডিফারেন্স'– তা চার্চিলের দুর্ভিক্ষ-সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মধুশ্রী মুখার্জীর কাজকে অস্বীকার করা উপায় নেই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি লাভ করেন নোবেল জয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী ইউইসিরো নাম্বুর অধীনে। পরে ক্যালটেক থেকে পোস্ট-ডক্টরেট করে বিখ্যাত 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' সাময়িকীর অন্যতম সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। তবে বিজ্ঞান-বিষয়ক সাংবাদিকতা ও বই লেখাই তার প্রধান অভিনিবেশ। প্রশিক্ষিত ইতিহাসবিদ নন ঠিকই, তাই বলে তিনি দুর্ভিক্ষের অঙ্ক কষতে জানেন না, একথা বলা যাবে না। ২০০২ সালে ব্রিটেনবাসীদের মধ্যে বিবিসি কর্তৃক পরিচালিত জরিপে চার্চিল হয়েছিলেন 'শ্রেষ্ঠ ইংরেজ'। এহেন ব্যক্তিত্বকে সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে গেলে সাহস ও দম উভয়ই থাকা চাই। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে ভারত থেকে যখন প্রস্তাব গেল যে, বাংলাকে দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করার জন্য মাসে অন্তত ৮০,০০০ টন খাদ্যশস্য জরুরি ভিত্তিতে সরবরাহ করা চাই, চার্চিল সেই অনুরোধ নাকচ করে দিয়েছিলেন। এটা প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত ঘেঁটে মধুশ্রী সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন তার বইয়ে। চার্চিলের এই সিদ্ধান্তে খুশি ছিলেন না ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ সরকারি কর্মকর্তারাও। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো যেমন মনে করেছিলেন যে, 'খাদ্যশস্য আমদানি হতে যাচ্ছে বাংলায়'– শুধুমাত্র এই খবরটি ছড়িয়ে দিলেও 'মজুতদারির প্রবণতা কমে যেত ও চালের দাম নেমে আসত।' অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা খাদ্যশস্য পাঠাতে চেয়েছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল পণ্যবাহী জাহাজের স্বল্পতা নিয়ে। কেননা জাহাজগুলোকে তখন ব্রিটিশ উপকূলের আশেপাশে জড়ো করে রাখা হয়েছিল। মধুশ্রী বলেছেন যে জাহাজের স্বল্পতার 'টেকনিক্যাল আর্গুমেন্ট' অনেকটাই কষ্ট কল্পিত। কারণ ততদিনে মার্কিন প্রশাসন সাহায্য হিসেবে অনেক মালবাহী জাহাজ ব্রিটেনের কাছে স্থানান্তর করেছিল। দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ার খবরে এমনকি ইংরেজের শত্রুপক্ষে যুদ্ধরত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি পর্যন্ত অধিকৃত বার্মা থেকে কিছু চাল বাংলাতে পাঠাতে চেয়েছিল। ব্রিটিশ সেন্সরশিপ সে তথ্যও পুরোপুরি চেপে যায়।

এবার আসি মূল্যস্ফীতির প্রসঙ্গে। শুধু যে খাদ্য-সরবরাহে অপ্রতুলতার কারণে প্রতি মাসে মূল্যস্ফীতির হার বাড়ছিল, তা নয়। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল সচেতনভাবে গৃহীত ম্যাক্রো-ইকোনমিক পদক্ষেপও। ২০১৮ সালের ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলির ২০ অক্টোবর সংখ্যায় প্রখ্যাত মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ ও জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদালয়ের অধ্যাপক ঊষা পাটনায়েক অভিযোগ করেছেন যে, বাংলার দুর্ভিক্ষ এমনিতেই হয়নি। বাংলায় দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি করে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থায়নের যোগাড়-যন্ত্র করা হয়েছিল। মানুষের ভোগের পরিমাণ কমিয়ে যুদ্ধের রসদ যোগানোর জন্য বিনিয়োগের তহবিল বাড়ানো হয়েছিল। এই ম্যাক্রো-ইকোনমিক যুক্তিটি এসেছিল অগ্রগণ্য অর্থনীতিবিদ কেইনসের লেখা থেকে। 'ট্রিটিস অন মানি : দ্য এপ্লাইড থিওরি অব মানি' (১৯৩০) এবং 'হাউ টু পে ফর দ্য ওয়ার :এ র‍্যাডিকেল প্ল্যান ফর দ্য চ্যান্সেলর অব দ্য এক্সচেকার' (১৯৪০) এই দুটি লেখায় কেইনস এই সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কীভাবে জনগণের আয় (ভোগ) কমিয়ে তা থেকে উদ্বৃত্ত আহরণ করা যায় যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত ব্যয়ের অর্থায়নের জন্য, সেটা কেইনসের আগ্রহের বিষয়বস্তু ছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে ব্রিটেনবাসীর ক্ষেত্রে এই মহৌষধির প্রয়োগ না করে তা ব্যবহার করা হয়েছিল ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সাধারণ অধিবাসীদের ক্ষেত্রে। বাংলার গ্রামাঞ্চলের

নিরীহ জনগণের ভোগ কমিয়ে তাদেরকে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিয়ে যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ তুলে নিয়েছিল চার্চিলের ইংরেজ সরকার। মধুশ্রী মুখার্জীর বইটি ও ঊষা পাটনায়েকের লেখাটিকে আমরা এই অর্থে সম্পূরক রচনা হিসেবে পাঠ করতে পারি।

মুখার্জী ও পাটনায়েকের লেখার মুখ্য প্রতিপাদ্যের সাথে অমর্ত্য সেন অপরিচিত নন। সেন তার 'পভার্টি অ্যান্ড ফেমিন' বইয়ে পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে বলতে গিয়ে সাতটি কারণের কথা বলেছেন। তার মধ্যে একটি কারণ ছিল চার্চিলের নিস্পৃহতাও। যেমন, তিনি বলছেন, 'The refusal of the British Government to permit move food imports into India through reallocation of shipping as an emergency measure to tackle the famine was severely criticized. Lord Wavell, who became the new Viceroy at the last stage of the famine and who had to battle hard for increasing food imports into India, went on record in this context that he felt that 'the vital problems of India are being treated by his Majesty's Government with neglect, even sometimes with hostility and contempt'– এই শেষোক্ত উদ্ধৃতিটির উৎস হচ্ছে লর্ড ওয়াভেলের চিঠি, ১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবরে লেখা উইনস্টন চার্চিলকে উদ্দেশ করে। অন্যদিকে ঊষা পাটনায়েকের যুক্তি– 'ইচ্ছে করে মূল্যস্ফীতি ঘটানো হয়েছিল যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য'– সেটিও পরোক্ষভাবে অমর্ত্য সেনের চোখে পড়েছিল। তিনি লিখছেন :'The 1943 famine can indeed be described as a 'boom famine' related to powerful inflationary pressures initiated by public expenditure expansion'. তবে সব কার্যকারণের মধ্যে সেনের প্রধান গুরুত্ব এসে পড়েছিল 'exchange entitlement'র দ্রুত অবনতির ওপরে– সামগ্রিকভাবে খাদ্যের যোগানের সাংবৎসরিক বাড়া-কমার ওপরে নয়। ১৯৪৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষে মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল গ্রাম-বাংলা, বিশেষত মজুরি-শ্রমের ওপর নির্ভরশীল কৃষি শ্রমিক ও অসচ্ছল প্রান্তিক জোতের পরিবারগুলো। এখানে সেনের মূল তর্কটা দুর্ভিক্ষের Causality বা মূল কার্যকারণসূত্র নিয়ে। যখন দুর্ভিক্ষবিরোধী 'পলিসির' প্রসঙ্গ এসেছে তখন তিনিও খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি, ফুড রেশনিং ব্যবস্থা, পাবলিক ওয়ার্কস প্রোগ্রাম, খাদ্যশস্যের মূল্য-পরিস্থিতিকে সহনশীল অবস্থায় নিয়ে আনা ইত্যাদি 'সরবরাহতাড়িত (supply-side)' কর্মসূচির ওপর জোর দিয়েছেন তার বইতে যথাযথভাবেই।

১৯৪৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে শুধু সরকারি প্রশাসক, ইতিহাসবিদ, পরিসংখ্যানবিদ বা অর্থনীতিবিদের সাক্ষ্যই যথেষ্ট নয়। সমসাময়িক সাহিত্য-কর্মের মধ্য দিয়ে এই দুর্ভিক্ষের চালচিত্র বিশ্বস্ততার সাথে ফুটে উঠেছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত' মন্বন্তরের প্রাককথন থেকে শুরু করে এর ট্র্যাজিক পরিণতি অবধি পাত্রপাত্রীদের পর্যবেক্ষণ করেছিল। জাপানি আক্রমণের মুখে ১৯৪২ সালের মে মাসে ইংরেজরা বার্মা থেকে যখন পিছু হটল, তখন বার্মা থেকে চাল আমদানিও আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে গেল। এ নিয়ে দুর্গাপণ্ডিত আর গঙ্গাচরণের মধ্যে কথা হচ্ছে:

"– জাপানিরা সিঙ্গাপুর নিয়ে নিয়েছে? যুদ্ধের খবর কী?

– শুধু সিঙ্গাপুর কেন, ব্রহ্মদেশও নিয়ে নিয়েচে। জানো না সে খবর?

– না-ইয়ে-শুনি নি তো? ব্রহ্মদেশ? সে তো–

– যেখান থেকে রেঙ্গুন চাল আসে রে ভায়া। ওই যে সস্তা, মোটা মোটা আলো চাল ..."

যুদ্ধরত ইংরেজ সেনাদের জন্য খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করতে চাল কেনার ধারা তো পূর্বাপর ছিলই, জাপানি আক্রমণের মুখে এই কেনার গতিবেগ আরও বেড়ে গেল। কোনোভাবেই যেন জাপানিদের কাছে চালের বাজার চলে না যায় সে জন্যে ঔপনিবেশিক সরকার স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরকে চাল কেনার অনুমতি দেয়। চাল বিক্রি করতে না চাইলে জবরদস্তিও হচ্ছিল যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির যুক্তি দেখিয়ে। এর ফলে কিছুটা অবস্থাপন্ন মানুষ যারা টাকা দিয়ে চাল কেনার সামর্থ্য রাখে, তারাও হাটে-দোকানে গিয়ে চাল পায়নি। যারা আরো অবস্থাপন্ন তাদের কাছে চাল থাকলেও চালের দাম আরও বাড়তে পারে– এই আশঙ্কায় তারাও চালের সংগ্রহ লুকিয়ে ফেলেছিল। এতে করে গঙ্গাচরণের মতো ক্রয়-নির্ভর পরিবারদের অনাহারে-উপবাসের ঝুঁকিতে দিন কাটাতে হয়েছিল। বিভূতিভূষণ লিখছেন একের পর এক ঘনায়মান দুর্যোগের দৃশ্য :

১. 'অনঙ্গ-বৌ বললে– আর দুটো ভাত মেখে নাও, ডাল দিয়ে পেট ভরে খাও–

–এ চাল দুটো ছিল বুঝি আগের দরুণ?

–হুঁ।

–কাল হবে?

–কাল হবে না। সকালে উঠেই চাল যোগাড় করো। রাতটা টেনেটুনে হয়ে গেল।

–সেই বিশ্বাস মশায়ের দরুণ ধানের চাল?

–হুঁ।

অনঙ্গ-বৌ স্বামী-পুত্রকে পেট ভরে খাইয়ে সে-রাতে এক ঘটি জল আর একটু গুড় খেয়ে উপোস করে রইলো।'

২. [পরের দিন গঙ্গাচরণ গেছে চালের খোঁজে। এক জায়গায় দেখল চাল বিক্রি হচ্ছে। একটু ক্ষণ আগেই গঙ্গাচরণ এক জেলে নবীন পাড়ুইকে বলেছে, 'কখনো কি কেউ শুনেচে যে চালের মণ ষোল টাকা হবে।' অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, এরই মধ্যে চালের দাম বেড়ে 'কুড়ি টাকা মণ' হয়ে গেছে। এত বেড়ে যাওয়ায় গঙ্গাচরণ যাও-বা কিছু কিনতে পারলো, নবীন পাড়ুই কিছুই কিনতে পেল না। মাছ ধরে তার যা উপার্জন তাতে করে তার ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে খাদ্যশস্যের মূল্য। কীভাবে অমর্ত্য সেন কথিত 'এক্সচেঞ্জ এনটাইটেলমেন্টের' দ্রুত অবনতি হচ্ছিল, তার বিবরণ মেলে তাদের কথায়]

'গঙ্গাচরণ বললে– নবীন, চাল নেবে না?

– না বাবাঠাকুর। একটা সিকি কম পড়ে গেল।

– তবে তো মুশকিল। আমার কাছেও নেই যে তোমাকে দেবো।

– আধসের পুঁটিমাছ ধরেলাম সামটার বিলে। পেয়েলাম ছ'আনা। আর কাল মাছ বেচবার দরুন ছেল দশ আনা। কুড়িয়ে-বুড়িয়ে একটা টাকা এনেলাম চাল কিনতি। তা আবার চালের দাম চড়ে গেল কী করে জানব?

– তাই তো!

– আধপেটা খেয়ে আছি দু'দিন। চাষিদের ঘরে ভাত আছে। আমাদের তা নেই। আমাদের কষ্ট সকলের অপেক্ষা বেশি। জলের প্রাণী, তার ওপর তো জোর নেই? ধরা না দিলে কী করছি! যেদিন পালাম সেদিন চাল আনলাম। যেদিন পালাম না সেদিন উপোস। আগে ধান-চাল ধার দিত। আজকাল কেউ কিছু দেয় না।'

৩. [চাল-সংগ্রহ অভিযানের কারণে অনেক বড় বড় দোকানেও কেনার জন্য চাল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না]

'কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার। বড় বড় তিন-চারটি দোকান খুঁজে বেড়ালে, সকলেরই এক বুলি– চাল নেই। গঙ্গাচরণের মনে পড়লো বৃদ্ধ কুণ্ডু মশায়ের কথা। ...কিন্তু সেখানেও তথৈবচ, গঙ্গাচরণ দোকানঘরটিতে ঢুকবার সময় চেয়ে দেখলে বাঁ পাশের যে বাঁশের মাচায় চালের বস্তা ছাদ পর্যন্ত সাজানো থাকে, সে জায়গা একদম খালি, হাওয়া খেলচে।...

গঙ্গাচরণ বললে– কিছু চাল দিতে হবে।

– কোথায় পাব, নেই।

– এক টাকার চাল, বেশি নয়। এই লোকটাকে উপোস করে থাকতে হবে। দিতেই হবে আপনাকে।

কুণ্ডু মশায় সুর নিচু করে বললে– সন্ধ্যের পর আমার বাড়িতে যেতে বলবেন, খাবার চাল থেকে এক টাকার চাল দিয়ে দেবো এখন।

গঙ্গাচরণ বললে– ধান-চাল কোথায় গেল? আপনার এত বড় দোকানের মাচা একদম ফাঁকা কেন?

– কী করব বাপু, সেদিন পাঁচু কুণ্ডুর দোকান লুট হওয়ার পর কী করে সাহস করে মাল রাখি এখানে বলুন! সবারই সে দশা। তার ওপর শুনচি পুলিশে নিয়ে যাবে চাল কম দামে মিলিটারির জন্য।...

– আমরা না খেয়ে মরব?

– যদিন থাকবে, দেবো। ...

– ...বুঝে কাজ করুন, কিছু চাল দেশে থাকুক, নইলে দুর্ভিক্ষ হবে যে! কী খেয়ে বাঁচবে মানুষ?

– বুঝি সব, কিন্তু আমি একা রাখলি তো হবে না। খাঁ বাবুরা এত বড় আড়তদার, সব ধান বেচে দিয়েচে গবর্নমেন্টের কনট্রাকটারদের কাছে। এক দানা ধান রাখেনি। এই রকম অনেকেই করেচে খবর নিয়ে দেখুন। আমিতো চুনোপুটি দোকানদার, পঞ্চাশ-ষাট মন মাল আমার বিদ্যে।'

৪. [মতি মুচিনী মারা যাচ্ছে। গঙ্গাচরণকে গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'বড্ড জ্বর দাদাঠাকুর, তিন দিন খাইনি, দুটো ভাত খাব।' তার পরের বিবরণী বিভূতিভূষণের লেখাতেই শুনুন]

'অনঙ্গ-বৌ শুনতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু সেও অত্যন্ত দুর্বল। উঠে মতির কাছে যাওয়ার শক্তি তারও নেই!

বললে– ওগো মতিকে কিছু খেতে দিয়ে এসো–

– কী দেবো?

– দুটো কলাইয়ের ডাল আছে ভিজনো। এক মুঠো দিয়ে এসো।

– ও খেয়ে কি মরবে? তার জ্বর আজ কত দিন তা কে জানে? মুখ-হাত ফুলে ঢোল হয়েচে। কেন ও খাইয়ে নিমিত্তের ভাগি হবো!

খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো অনঙ্গ। কিন্তু অন্য কিছুই ঘরে নেই। কী খেতে দেওয়া যায়, এক টুকরো কচু ঘরে আছে বটে, কিন্তু তা রোগীর খাদ্য নয়। ... ভেবেচিন্তে অনঙ্গ-বৌ বললে– হ্যাঁ গা, কচু বেটে জল দিয়ে সিদ্ধ করে দিলে রোগী খেতে পারে না?

– তা বোধ হয় পারে। মানকচু?

[ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্কুলের শিক্ষক গঙ্গাচরণের উনোনেরই যদি এই দশা হয় আরও নিম্ন-আয়ের সাধারণ মানুষের পরিস্থিতি যে কতটা ভয়াবহ হচ্ছিল, তা এর থেকে অনুমেয়।]

৫. [অবশেষে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর ঘটনা সত্য বলে প্রমাণ হলো। বিভূতিভূষণ তার অননুকরণীয় বর্ণনায় সেই আপাত অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা লিখছেন। সে বর্ণনা চার্চিল-কেইনস্ বা ঔপনিবেশিক ভারতের ভাইসরয়রা কেউ পড়েননি, কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের 'অশনি সংকেত' ছবির কল্যাণে পরে মতি মুচিনীর মৃত্যু সমগ্র পশ্চিমা জগতে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল]

'গ্রামে থাকা খুব মুশকিল হয়ে পড়লো মতি মুচিনীর মৃত্যু হওয়ার পরে। অনাহারে মৃত্যু এই প্রথম। এর আগে কেউ জানত না বা বিশ্বাসও করেনি যে অনাহারে আবার মানুষ মরতে পারে। এত ফল থাকতে গাছে গাছে, নদীর জলে এত মাছ থাকতে, বিশেষ করে এত লোক যেখানে বাস করে গ্রামে ও পাশের গ্রামে, তখন মানুষ কখনও না খেয়ে মরে? কেউ না কেউ খেতে দেবেই। না খেয়ে সত্যিই কেউ মরবে না।

কিন্তু মতি মুচিনীর ব্যাপারে সকলেই বুঝলে, না খেয়ে মানুষে তাহলে তো মরতে পারে। এত দিন যা গল্পে-কাহিনীতে শোনা যেত, আজ তা সম্ভবের গণ্ডির মধ্যে এসে পৌঁছে গেল। কই, এই যে একটা লোক মারা গেল না খেয়ে, কেউ তো তাকে খেতে দিলে না? কেউ তো তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারলে না? সকলের মনে বিষম একটা আশঙ্কার সৃষ্টি হলো। সবাই তো তাহলে না খেয়ে মরতে পারে!'

'অশনি সংকেত' ছাড়াও সে সময়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন তার 'মন্বন্তর' উপন্যাস (দুর্ভিক্ষের ওপরে লেখা বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি তখনই জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছিল)। ১৯৪২ সালের শীত-মৌসুমের খাদ্যশস্য বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ফলে অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেল দক্ষিণ বঙ্গের জেলাগুলোতে। 'মন্বন্তরে' তারাশঙ্কর লিখেছেন :'লোক কয়েকটি মেদিনীপুরের অধিবাসী। ঘরবাড়ি ভেঙে মাটির ঢিবি হয়ে গেছে, গরু-বাছুর ভেসে গেছে, জলোচ্ছ্বাসে জমির বুকে চাপিয়ে দিয়েছে বালির রাশি। অন্ত নেই– এমনকি তৃষ্ণা মিটিয়ে জলপান করবারও উপায় নেই– জল লবণাক্ত হয়ে গেছে।' এই বন্যা-জলোচ্ছ্বাস-ঘূর্ণিঝড় দুর্ভিক্ষের প্রাগ-পটভূমি সৃষ্টি করেছিল। মন্বন্তরে বিজয়দা নীলাকে লিখছে :'এখন মাঘ মাস, এরই মধ্যে দেখছি– ধান প্রায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। গত বছরের ডিনায়েল পলিসি, এ বছরের অজন্মা, এর ওপর চোরা বাজারের কালো কাপড় ঢাকা হাত ধান টেনে নিচ্ছে...মানুষ মরছে; দলে দলে দেশ ত্যাগ করছে; স্ত্রী-কন্যাকে ফেলে পালাচ্ছে, সন্তান বিক্রী করছে, বিশেষ করে কন্যা-সন্তান।' মন্বন্তর

উপন্যাসটি সমসাময়িকতায় বিদ্ধ হলেও আদর্শ প্রচারের কারণে ততটা শিল্পোত্তীর্ণ হতে পারেনি। তারাশঙ্কর একদিকে মহাত্মার অনুসারী, অন্যদিকে বামপন্থি চিন্তাধারার প্রভাবও স্বীকার করে নিচ্ছেন। এ দুইয়ের মিলিত উচ্ছ্বাস মাঝেমধ্যেই তার পাত্র-পাত্রীদের কথার মধ্যে উপচে পড়ে। একটি উদাহরণ দিই, শহর কলকাতায় তখন দুর্ভিক্ষপীড়িত জনস্রোত ঢুকে পড়েছে। বাকিটা তারাশঙ্করের বর্ণনায় শুনুন:

'নীচে পথের উপর থেকে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে ডাক উঠল– ভাত দাও মা চারটি, বাসি ভাত! নীলা এবং কানাইয়ের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। এ মন্বন্তর শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাসাটা তাদের কাছে অপরাধ বলে মনে হলো।

বিজয়দা লেখা সমাপ্ত করে বললো– কানাই ভাই, এইবার কাজে নেমে পড়ো, নীলা ভাই, কমরেডের সঙ্গে তুমিও লেগে পড়ো। ...

নীলা এবার বললে– বলুন, কী করব? কাজ বলে দিন।

– কাজ অনেক। মানুষকে, এ মন্বন্তরের দুর্যোগ পার করে নিয়ে যেতে হবে।'

'মন্বন্তর উপন্যাসে একটি কৌতূহল-জাগানো তথ্য আছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের স্বতন্ত্র সদস্য মিস এলিয়েনর র‍্যাথবোন (Rathbone)-কে: 'সমগ্র ব্রিটিশ নৌবহর ইংল্যাণ্ডের বন্দরে বন্দরে পৌঁছে দিচ্ছে রাশি রাশি খাদ্যদ্রব্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে। আর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত আমাদের দেশের মানুষের কাছে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় এক গাড়ি খাদ্যও পৌঁছাবার ব্যবস্থা হয় না।' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে আরও কথাসাহিত্য লেখা হয়েছে বাংলায়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গোপাল হালদারের ট্রিলজি– 'পঞ্চাশের পথ', 'ঊনপঞ্চাশি' ও '১৩৫০'। লঙ্গরখানা খোলার কথা আছে অনেক গল্পে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'নয়নচারা' গ্রন্থের 'মৃত্যুযাত্রা' গল্পে গ্রাম ছেড়ে নিরন্ন মানুষের অশক্ত পথচলার বিবরণ পাই। দুর্ভিক্ষের সময়ে ওয়ালীউল্লাহ কলকাতায় অবস্থান করছিলেন এবং বামধারার ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্ট ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'মৃত্যুযাত্রা' গল্পে তিনি লিখছেন :'তিনু কিছু বললে না। হঠাৎ কী হয়েছে তার– নদীর অপর তীর দেখবার জন্য তার মনটা আকুল হয়ে উঠেছে। তার আশঙ্কা হচ্ছে– মহাসাগরের তীরে যেন বসে রয়েছে। পথ ভুল করে কি তারা সীমাহীন মহাসাগরের তীরে এসে বসেছে মরণের পারে যাবে বলে?... ক'দিন হলো মতি উধাও হয়ে গেছে গাঁ থেকে এবং তার খোঁজে সে এদের সঙ্গ নিয়েছে। তা ছাড়া গাঁয়ে যে রকম বীভৎস আকাল লেগেছে, সেখানে থাকলে মৃত্যু নিশ্চিত।' দুর্ভিক্ষের কারণে জমি সামান্য টিপসই দিয়ে বিক্রি করে দিয়েছিল নিরন্ন কৃষক, এ কথা শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সংশপ্তক' আমাদের জানিয়েছে। আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ি' উপন্যাসে জয়গুণ ১৯৪৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষের স্মৃতিচারণ করছে এভাবে :'পঞ্চাশ সনের কথা মনে হয়। একটা রোজাও রাখা হয়নি। রোজা রাখার কথা মনেও হয়নি। এক বাটি ফেনের জন্য ছেলেমেয়ে নিয়ে কত জায়গায়-কত বাড়িতে তাকে ঘুরতে হয়েচে... মাঝেমধ্যে সারারাত সারাদিন কেটেছে, একটা দানাও পড়েনি পেটে।'

হুমায়ূন আহমেদ তার ধ্রুপদী রচনা 'মধ্যাহ্ন' উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তরকে প্রোথিত করেছেন। তাতে করে দেখা যায়, শুধু পশ্চিমবঙ্গে এবং কলকাতায় নয়, এই দুর্ভিক্ষের প্রভাব পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। চাল কিনে যুদ্ধরত ইংরেজ সেনাদের সুরক্ষিত করার জন্য 'প্রকিউরমেন্ট পলিসি' দুর্ভিক্ষকে অনিবার্য করে তুলেছিল। ফিরে যাই হুমায়ূনের বর্ণনায় :

১. [আর, পি, সাহার কথা মনে রেখেই কি নিচের এই স্তবকটি লিখেছিলেন হুমায়ূন? স্মর্তব্য, রণদা প্রসাদ পরে 'দানবীর'রূপে সমধিক পরিচিতি পেলেও তার 'প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ন' হয়েছিল যুদ্ধের বাজারে– দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে– ধান-চালের মজুদদারি করেই একথা আবদুল্লাহ্ ফারুক তার একটি লেখায় আমাদের জানিয়েছেন]।

'বান্ধবপুর বাজারে এককড়ি সাহার চালের আড়ত। তিনি সামান্য পুঁজি দিয়ে শুরু করেছিলেন। যুদ্ধের কারণে এখন রমরমা অবস্থা। ধান-চালের দাম প্রতিদিনই বাড়ছে। আরও বাড়বে– এ রকম গুজব বাতাসে ভাসছে। সব চাল নাকি মিলিটারিরা কিনে নিবে।... দেশের চাল সব সরকার কিনছে। এদিকে আবার বার্মা মুলুক থেকে চাল আসা বন্ধ। জাপানিরা বার্মা দিয়ে ভাতরবর্ষে ঢুকবে।'

২. [এটা গেল দুর্ভিক্ষের 'ব্যাকগ্রাউন্ডের' কথা। এবার হুমায়ূন দেখাবেন কী করে মজুদদারি শুরু হয়ে গেল সরকারি ক্রয়-অভিযানের আড়ালে]

'এককড়ি হারিকেন নিভিয়ে দিয়েছেন। কেরোসিনের সাশ্রয় করতে হবে।... আধো অন্ধকারে এককড়ি দোকানের কর্মচারীদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। গলা নামিয়ে বললেন, চাল কিনা শুরু করো। দাম কিছু বেশি হলেও কিনবা। বড় নৌকা নিয়ে ভাটি অঞ্চলের দিকে যাও। সেখানে ধান-চাল দুইই সস্তা।'

৩. [অসুস্থ অবস্থায় মাওলানা ইদরিস শুয়ে আছেন শিয়ালদহ রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। তিনি একা নন, তার পাশে দুর্ভিক্ষে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে এমন অনেকেই শুয়ে আছে। এদেরকে আলাদা করা হয়েছে। এরপর শোনা যাক হুমায়ূনের বর্ণনায়]

'হাসপাতালে রোগীর জায়গা নেই। স্বেচ্ছাসেবীরা কিছু সাহায্যের চেষ্টা করছে। সেই সাহায্য কোনো কাজে আসছে না। মাওলানাকে সকালবেলা একটা রুটি দেওয়া হয়েছে। মাওলানা রুটি খাননি। রুটি চারপাশে পড়ে আছে, সেখানে পিঁপড়া উঠেছে। মাওলানা আছেন প্রবল ঘোরে। সারাক্ষণই তার মনে হচ্ছে মাথার ভেতর দিয়ে ট্রেন চলাচল করছে।'

[এরপর একটু যখন ভালো হবেন মাওলানা ইদ্রিস স্বয়ং ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসায়, তার দেখা হয়ে যাবে তরুণ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে। তিনি তখন 'গণদেবতা' লিখছেন। যিনি কখনও হাদিস-কোরানের বাইরে কোনো গল্প-উপন্যাস পড়েন নাই, তাকে তারাশংকর পড়ে শোনাবেন 'গণদেবতা' থেকে : 'সোঁ সোঁ শব্দে প্রবল ঝড়। ঝড়ে চালের খড় উড়িতেছে, গাছের ডাল ভাঙিতেছে। বিকট শব্দে ওই কার টিনের ঘরের চাল উড়িয়া গেল।' এ যেন গল্পের মধ্যে গল্প।]

১৯৪৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষের একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এর প্রভাব সারা বাংলাতেই অনুভূত হয়েছিল। অমর্ত্য সেন তার পভার্টি অ্যান্ড ফেমিন বইতে লিখেছেন যে, এই দুর্ভিক্ষ অগ্রসর হয়েছিল তিনটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায় বিস্তৃত ছিল ১৯৪২-র শুরু থেকে ১৯৪৩-র মার্চ পর্যন্ত, যখন আদিগন্ত দুর্ভিক্ষের নগ্ন পদধ্বনি শোনা গেছে। দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৪৩ সালের মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চলেছে; এই পর্বে অনাহারে গ্রাম-বাংলার মানুষ মরতে শুরু করছিল। বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত' প্রথম পর্যায় থেকে শুরু হয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে শেষ হয়ে যায়। তৃতীয় পর্যায় চলেছে ১৯৪৩ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৪ সালের শেষ নাগাদ। এই পর্যায়ে খাদ্য-সংকট পরিস্থিতির উন্নতি হলেও মৃত্যুর হার কমার পরিবর্তে ক্রমেই বেড়ে চলছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষের 'সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত' জেলাগুলোর মধ্যে

ছিল চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলী। 'মাঝারি ক্ষতিগ্রস্ত' এলাকার মধ্যে ছিল যশোর, খুলনা ও বরিশাল আর 'সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত' জেলাগুলোর মধ্যে ছিল রংপুর, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, নদিয়া প্রভৃতি। অর্থাৎ এ তালিকা থেকে স্পষ্ট যে, ১৯৪৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষে বিশেষভাবে পীড়িত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের জেলাগুলো। জাপানি আক্রমণের আশঙ্কা, ঔপনিবেশিক সরকারের চাল মজুদ করার নীতি বা তথাকথিত 'ডিনায়েল পলিসি', চালের পণ্যবাহী ছোট-মাঝারি নৌকাগুলো (১০ জনের বেশি লোক উঠতে পারে এমন সব নৌকা) ধ্বংস করে ফেলা এসবই পূর্ববঙ্গের স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্যাভাব বাড়িয়ে দিয়েছিল ও দুর্ভিক্ষাবস্থার প্রেক্ষিত সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশরা নিজেরাই তাদের তৈরি উনিশ শতকের 'ফেমিন কোড' অনুসরণ করেনি। করলে, পঞ্চাশের মন্বন্তর সহজেই এড়ানো যেত। শেষ পর্যন্ত এ রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন অমর্ত্য সেন।

সংকটটা আরও সহজে সমাধান করা যেত যদি প্রাদেশিক সরকার আরও সচেষ্ট হতো। বাংলায় তখন খাজা নাজিমুদ্দিনের মুসলিম লীগ সরকার। সুব্রত রায়চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, 'ব্রিটিশ সরকারের... জনবিরোধী কার্যকলাপের পাশাপাশি... নাজিমুদ্দিন সরকারও মুনাফার মৃগয়ায় মেতে ছিল। এই সময়ে ৬ টাকা বেশি দরে খাদ্য বিক্রি করে বাংলার মুসলিম লীগ সরকার... ৭৫ লাখ টাকা মুনাফা করে।' বেঙ্গল মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ইস্পাহানীকে সরকার থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় চাল বাংলা থেকে সংগ্রহের জন্য। দুর্ভিক্ষ পরবর্তী ফেমিন কমিশনের কাছে ইস্পাহানী এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, ১৯৪২ সালের মে মাসের মধ্যেই দেশীয় এজেন্টদের মাধ্যমে 'চল্লিশ হাজার মণ' চাল কিনে তিনি যুদ্ধের জন্য মজুদের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ১৯৪৩ সালের মে মাস নাগাদ এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় '২,৩৫,৫৫৭ মণ', যা ইস্পাহানী প্রতি মণ ১৪ টাকা ১২ আনা ৭ পাই দরে বাংলা সরকারের কাছে বিক্রি করেছিল– যখন বাজার মূল্য ছিল ৩২ টাকা মণ। এতে করে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, দুর্ভিক্ষে যখন লোক মারা যাচ্ছে, তখন এত পরিমাণ চাল মজুদ করার অর্থ কী? বোঝাই যাচ্ছে, চার্চিলকে তো বটেই, তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকারকেও কিছুটা দায়দায়িত্ব নিতে হবে এই দুর্ভিক্ষ নিবারণে ব্যর্থতার জন্য। বেঙ্গল মুসলিম লীগ রিলিফ কমিটির সম্পাদক চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন এই পরিস্থিতির সৃষ্টি পেছনে রাজনৈতিক দায়দায়িত্ব না এড়ানোর জন্য লীগ নেতৃবৃন্দকে পরোক্ষভাবে সতর্ক করে দিচ্ছেন। এলা সেনের পূর্বোক্ত বইটি থেকে তা তুলে দিচ্ছি :

"From March or April this year (1943) people began to starve because rice had disappeared from the market and the black market rate was so high... it was beyond the reach of the people... Many people had to quit their villages in search of food in the town; these who remained in the villages had to perish... Bengal is threatened with physical extinction and moral collapse. Where will be the Muslim League if hundreds of thousands of Muslims die? What will be the meaning of Pakistan where there will be skeleton-like sub-humans in desolate villages?"

দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের নিয়ে কি কাঙ্ক্ষিত আদর্শের 'পাকিস্তান' গড়ে তোলা যাবে? এই ছিল চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রশ্ন। পরবর্তীতে, দেশভাগের পর মুসলিম লীগ যে দ্রুত জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল তারও পেছনে ছিল সাধারণ জনমানুষের খাদ্য-সংকটের যথাযথ মোকাবেলা না করতে পারার ব্যর্থতা। সেটি আমরা বদরুদ্দিন উমরের ধ্রুপদী গ্রন্থ 'পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' এর

সুবাদে অনেক আগেই জেনেছি। ঐতিহাসিক আহমেদ কামালও তার 'স্টেট এগেইনস্ট নেশন' বইতে এ নিয়ে লিখেছেন।

তবে সরকারের বাইরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের পক্ষ থেকে জেলায় জেলায় অনেকেই দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় এগিয়ে এসেছিলেন। চট্টগ্রাম ছিল অত্যন্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকা। সেখানে পুর সমাজ, বিশেষত প্রগতিমনা অংশের উদ্যোগে দুর্ভিক্ষ-নিবারণের চেষ্টা হয়েছিল। 'নিচের থেকে উদ্যোগের' এই উদাহরণগুলোকে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা দরকার, এতে করে দুর্যোগ প্রতিরোধে পুর সমাজের সম্ভাব্য তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার দিকটি স্পষ্ট হবে। সব কিছুর জন্য–অনুদান থেকে বিদ্যাদানের প্রয়োজন অবধি– রাষ্ট্রের ওপরে নির্ভর করার ধারা এক রুগ্ন মানসিকতার পরিচায়ক। মাহবুব উল আলম চৌধুরীর স্মৃতিচারণ 'স্মৃতির সন্ধানে' গ্রন্থটির বিরল একটি অধ্যায়ের নাম 'যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের খণ্ডচিত্র'। তরুণ মাহবুব উল আলম লিখছেন : 'ইতোমধ্যে আমরা চট্টগ্রাম শহরে তিনটি লঙ্গরখানা খুলি এবং কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত বেবি হোমেও নিয়মিত আর্থিক সহায়তা দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ... দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকার্য চালাতে গিয়ে আমি কমিউনিস্ট পার্টির আরও নিকটবর্তী হয়ে উঠি। ... এ ছাড়া আগে থেকেই আমার মামার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল পূর্ণেন্দু দস্তিদার, কল্পনা দত্ত, কল্পতরু সেনগুপ্ত ... প্রমুখ কীর্তিমান পার্টি নেতাদের সঙ্গে। ... একদিন মা প্রস্তাব করলেন [একজন প্রতিবেশী হিন্দু রমণী যাকে মাতৃহারা মাহবুব উল আলম 'মা' বলে ডাকতেন এবং যিনি ভাবতেন 'পূর্বজন্মে' মাহবুব নিশ্চয়ই 'ব্রাহ্মণ ছিলেন'] চল দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যার্থে আমরা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি। ... সবাই দুর্ভিক্ষের ওপর একটি নাটক লেখার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমি নতুন মায়ের নির্দেশে কয়েকদিনের মধ্যে একটি নাটক খাড়া করলাম। দুর্ভিক্ষের ওপর বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' ... নাটকের কোনো কপি ছিল না। ফলে এই নাটক রচনায় আমি কমরেড পূর্ণেন্দু দস্তিদারের সাহায্য নিয়েছিলাম, মনে পড়ে। খুব উৎসাহের সঙ্গে স্থানীয় মুসলিম হলে আমার 'ভাঙন' নাটকটি অভিনীত হলো। ... অনেক টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল। যদ্দুর মনে পড়ে, টাকাটা ত্রাণকার্যে রত বেবি হোমসহ বেশ ক'টি সাহায্য সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল।'

পুর সমাজের পর্যায়ে দুর্ভিক্ষ-নিবারণে ত্রাণকার্য পরিচালিত হলেও দুর্ভিক্ষের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া চলেছিল আরও বহু বছর ধরে। ১৯৪৩-৪৪ সালের পটভূমি ও কার্যকারণ সূত্র নিয়ে যত গবেষণা হয়েছে এর সামাজিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে ততটা আলোচনা বা অনুসন্ধান হয়নি। ২০০৭ সালে এসে মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখেছেন, 'এভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের দিনগুলো শেষ হলো বটে, কিন্তু আমাদের সমাজ জীবনে তাতে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ক্ষত এত বছর পরেও শুকায়নি।' এদিকটা গবেষকদের বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে।

৬। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ

সেদিনের কথা আজও মনে পড়ে। ঢাকা কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আগস্ট বা সেপ্টেম্বর। রৌদ্র ঝকঝকে দিন। মিরপুর রোড যথারীতি ব্যস্ত। রাস্তার এধারে হকারের বইপত্র দেখছি। পাশে ন্যুমার্কেটগামী রিকশার ভিড়। রাস্তার ওধারে ৪ টাকা দামের কিমা পরোটা ভাজা হচ্ছে, তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। হঠাৎ করে চোখে পড়ল এই শাহরিক ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে একজন তিরিশোর্ধ্ব নারী টেনে টেনে রাস্তা পার হচ্ছেন। হেঁটে নয়– শুয়ে, নিজেকেই ক্লান্তভাবে টানছেন। তার পরনে কোনো কাপড় নেই! এ রকম দৃশ্য এর আগে আমি কখনও দেখিনি। গল্পের বইতেও পড়িনি। আমার ধারণা,

ঢাকা শহরও এর আগে এ রকম হতবাক করা দৃশ্য কখনও দেখেনি। এর পরে যথারীতি আমার বাস এল। সেটায় চড়ে বাড়ি ফিরে গেছি আর সব দিনের মতো। কিন্তু দৃশ্যটা এখনও জীবন্ত হয়ে আছে মনে। জিজ্ঞেস করাতে কে একজন বলল, 'বুঝলে না। দুর্ভিক্ষ চলছে রংপুরে। এরা সেই রংপুর থেকে খাবারের খোঁজে ঢাকা শহরে চলে এসেছে।' এরপর যতবার গেছি ঐ জায়গা দিয়ে, প্রতিবারই মনে পড়েছে সেই অজানা অনাম্নী নারীর কথা। সে বেঁচেছিল কিনা সে বছর, অথবা এখনও বেঁচে আছে কিনা জানি না। মহিউদ্দিন আলমগীরের হিসাব উদ্ধৃত করে অমর্ত্য সেন লিখেছেন, '১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিল প্রায় পনেরো লক্ষ মানুষ।' হতে পারে, সেই নারী প্রায় ৬ হাজার লঙ্গরখানার একটিতে আশ্রয় পেয়েছিল, অথবা হতে পারে, সেই আশ্রয় পাওয়ার পরেও সে বাঁচতে পারেনি। মানুষ তো শুধু ক্ষুধায় মারা যায় না, এর সাথে জড়িয়ে থাকে, কত নিগ্রহ-অসম্মান, কত অসুখ-বিসুখ। এজন্যেই বলে 'মারী ও মন্বন্তর'। আমার নিজের ধারণা, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের যে প্রজন্ম নিজেদের 'লস্ট জেনারেশন' ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল, তার পেছনে ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি দুর্ভিক্ষের এক দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়া প্রভাব ফেলে থাকবে। স্বাধীনতা-উত্তর যৌবনিক উচ্ছ্বাসের আনন্দময় মূহূর্তগুলো সাময়িককালের জন্যে হলেও ঢেকে গিয়েছিল দুর্ভিক্ষজনিত আতঙ্ক, বিষাদ ও হতাশায়। তর্ক উঠলেও বলা যেতে পারে, সামাজিক মূল্যবোধের প্রকৃত অবক্ষয়ের শুরু সেই থেকে।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখালেখির শেষ নেই। এর কার্যকারণ, মৃত্যুর ব্যাপ্তি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফ্যাক্টরের তুলনামূলক গুরুত্ব এ নিয়ে আজও চর্চা হয়। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে প্রতিনিধিত্বশীল পাঁচটি রচনার এখানে উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমেই আসবে অমর্ত্য সেনের 'পভার্টি অ্যান্ড ফেমিন' গ্রন্থটি, যার কথা এর আগে বলেছি। এটি ১৯৮১ সালে প্রকাশিত। আমার দ্বিতীয় পছন্দ হলো, মহিউদ্দিন আলমগীরের 'ফেমিন ইন সাউথ এশিয়া : পলিটিক্যাল ইকোনমি অব মাস স্টারভেশন'। এটি ১৯৮০ সালে প্রকাশিত। আলমগীর বইটি লেখেন ১৯৭০-এর দশকে যখন তিনি বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আমার তৃতীয় পছন্দ হলো ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত মার্টিন র‍্যাভালিয়নের 'মার্কেটস অ্যান্ড ফেমিনস্'। আমার তালিকার চতুর্থ অবস্থানে আছে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত 'পলিটিক্স অব ফুড অ্যান্ড ফেমিন ইন বাংলাদেশ'– এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, প্রথম তিনটির মতো বই নয় যদিও, কিন্তু চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের পেছনে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র তথা মার্কিন হস্তক্ষেপের ভূমিকার বিরুদ্ধে উন্মোচনমূলক প্রথম প্রতিবাদ (ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি সাময়িকীতে প্রকাশিত)। সবশেষে উল্লেখ করব অধ্যাপক নুরুল ইসলামের 'দ্য বার্থ অব এ নেশন : এন ইকোনমিস্ট'স টেল' বইটির দুর্ভিক্ষ-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদটি। এর বাইরে অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান ওসমানী তার একাধিক লেখায় চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ, সেনের 'এক্সচেঞ্জ এনটাইটেলমেন্টে'র তত্ত্ব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তত্ত্বীয় দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি, বাংলা ১১৭৬ সালের বা বাংলা ১৩৫০ সালের মন্বন্তর নিয়ে যেখানে গবেষণাপত্রের অপ্রতুলতা রয়ে গেছে, ইংরেজি ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ সে পরিপ্রেক্ষিতে– বিভিন্ন নিরিখের কাজের মধ্য দিয়েই– এক বহুল আলোচিত বিষয়।

এসব লেখাপত্র থেকে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের প্রভাবক ও কার্যকারণ সম্পর্কে যেসব প্রবণতা মোটা দাগে বেরিয়ে আসে তা নিম্নরূপ। প্রথমত, উপর্যুপরি বন্যার তীব্র আঘাত। ব্রহ্মপুত্র সে বছর যেন ফুঁসে উঠেছিল। অন্যান্য নদ-নদীর পানিও অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়ছিল। ১৯৭৪ সালের জুন মাসের শেষের

বন্যায় আউশ ধানের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। ১৭ই জুলাই দেশের সব বড় নদীগুলোর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে, অর্থাৎ আউশ ফসল ওঠার মৌসুমেই বন্যার পানি ছড়িয়ে পড়ে ধানক্ষেতে-মাঠে। এই ক্ষতিটা সামাল দেওয়া যেত আমন ধান আবাদের মাধ্যমে। কিন্তু আউশ ধান নষ্ট হওয়ার ১৫ দিনের মাথায় অর্থাৎ জুলাইয়ের শেষে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহেই পানি আবার হুহু করে বাড়তে থাকে। যেসব জমিতে আমনের বীজতলা তৈরি হচ্ছিল সেগুলো ক্ষতির মুখে পড়ে যায়। ১লা আগস্ট চট্টগ্রাম ও সিলেটের সাথে ঢাকার সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বন্যার পানি বেড়ে ওঠার কারণে। ১১ই আগস্ট নাগাদ ঢাকার সাথে উত্তরবঙ্গের সমস্ত সড়ক ও রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। আগস্টের মাঝামাঝি বন্যার পানি বাড়তে বাড়তে সে বছরের রেকর্ড-উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছে। এতে করে নতুন বোনা আমন ধানের একটা বড় অংশ ক্ষতির কবলে পড়ে। কিন্তু মূল আঘাতটা আসে সেপ্টেম্বরে। এ সময় বন্যার পানি ধীরে ধীরে কমার কথা। কিন্তু সে বছর ব্রহ্মপুত্র নদের পানি সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে আবারো বিপদসীমা অতিক্রম করে। এতে করে আগস্ট মাসের বন্যার পরে যতটুকু আমন ধান বেঁচে ছিল সেটুকুও (রোপা আমনের অধিকাংশ) বন্যার পানিতে নষ্ট হয়ে যায়। এ রকম উপর্যুপরি বন্যার আঘাতের পর সেপ্টেম্বরের শেষে এসে দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হওয়ার সরকারি ঘোষণা দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না সেদিন।

দ্বিতীয়ত, প্রায় ৬ হাজারের মতো লঙ্গরখানা খোলা না হলে আরও অনেক মৃত্যু আমাদের দেখতে হতো সন্দেহ নেই। তবে আরও বেশি সংখ্যায় এবং দীর্ঘদিনের জন্য লঙ্গরখানা খোলা/চালু রাখার জন্য চাই প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের মজুদ, আর সেই মজুদের সরকারি ক্ষমতা কমে গিয়েছিল সে বছর আন্তর্জাতিক তথা মার্কিন ষড়যন্ত্রে। ১৯৭৩ সাল থেকেই বাংলাদেশকে খাদ্যশস্য 'সাহায্য' (ফুড এইড) হিসেবে দেওয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করছিল প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মার্কিন সরকার। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে অবস্থাটা এত গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছে যে, বাংলাদেশ বাধ্য হয় সোভিয়েত ইউনিয়নকে খাদ্য সাহায্যের অনুরোধ জানাতে। রাশিয়া ছিল নিজেই আমেরিকা ও কানাডা থেকে খাদ্যশস্যের এক বড় আমদানিকারক। প্রায় ২ লাখ টন খাদ্যশস্য রাশিয়ার ক্রীত মজুদ থেকে সরিয়ে নিয়ে বাংলাদেশের সাহায্যার্থে প্রেরণের জন্যে এক জরুরি অনুরোধ জানানো হয়। রাশিয়া সেই ডাকে তখন সাড়াও দেয়। নইলে, ১৯৭৩ সালের জুলাই-আগস্ট মাসেই এ দেশের পাবলিক রেশন প্রদানের ব্যবস্থা ভেঙে পড়ত। যুক্তরাষ্ট্রের বিরূপ নীতির ফলে (নিক্সন-কিসিঞ্জার চক্র তখন রাষ্ট্র ক্ষমতায়) সে দেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানির ধারা চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের আগে থেকেই ছিল নিম্নাভিমুখী। ফলে ১৯৭২-৭৩ সালে যেখানে বাংলাদেশের মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল গড়ে মাসে ২ লাখ ৩২ হাজার টন, ১৯৭৩ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭৪ সালের মার্চ পর্যন্ত তা নেমে আসে গড়ে মাসে ৭৪ হাজার টনে মাত্র। অর্থাৎ, চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের কয়েক মাস আগে থেকেই খাদ্যশস্যের আমদানি পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এর একমাত্র বিকল্প হতে পারত আন্তর্জাতিক বাজারে গিয়ে সরাসরি খাদ্যশস্য কেনা। কিন্তু সেখানেও খাদ্যশস্যের দাম বাড়ছিল লাফিয়ে লাফিয়ে–১৯৭২-৭৩ সালে যার দাম ছিল টনপ্রতি ১১৫ ডলার, ১৯৭৩-৭৪ সালে তার দাম গিয়ে দাঁড়ায় টনপ্রতি ১৯৯ ডলারে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য কেনার মতো যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল না সরকারের হাতে সেদিন। ১৯৭৩ সালের ২য় ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) রিজার্ভের পরিমাণ ছিল যেখানে ১৩৫ মিলিয়ন ডলার, ১৯৭৪ সালের ২য় ত্রৈমাসিকে সেই রিজার্ভের পরিমাণ কমে দাঁড়ায় মাত্র ৬০ মিলিয়ন ডলারে। দুর্ভিক্ষ যখন চলছিল, সেই ৩য় ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) রিজার্ভের পরিমাণ আরও কমে যায়– সর্বনিম্ন ৪০

মিলিয়ন ডলারে। বাড়তি খাদ্যশস্য সাহায্য পাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না সেদিন খাদ্যশস্যের সরকারি মজুদ বাড়ানোর জন্যে। কিন্তু সে সম্ভাবনাও বানচাল হয়ে যায় যখন কিউবায় পাট রপ্তানি করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ– এই অজুহাতে খাদ্যশস্য রপ্তানি করা বন্ধ করে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ব্যাপারটা একটু খোলাসা করে বলার দাবি রাখে।

১৯৭৪ সালের ২৯শে মে (এরই মধ্যে তীব্র মৌসুমী বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং বিধ্বংসী বন্যা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে) অকস্মাৎ ডেভিড বোস্টার তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেনের কাছে জরুরি সাক্ষাৎকার চাইলেন। বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (বিজেএমসি) সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবায় ৪০ লাখ পাটের ব্যাগ রপ্তানির পরিকল্পনা করছে, এ রকম খবর পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে বলে বোস্টার জানতে পেরেছেন। এটা করা হলে মার্কিন খাদ্যশস্য 'সাহায্যের' নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশ কোনো খাদ্য-সহায়তা পাবে না। 'পাবলিক ল ৪৮০' অনুযায়ী শত্রু দেশ ভিয়েতনাম ও কিউবার সাথে বাণিজ্য করা কোনো দেশ মার্কিন খাদ্য সাহায্যের সুবিধা পাবে না। এটাই সে দেশের কংগ্রেসের বিধান। তখন বোস্টারকে জানানো হলো যে, (ক) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের শোচনীয় পরিস্থিতি লাঘবের জন্যে হলেও এই পাট রপ্তানি করা দরকার, এবং (খ) চাইলে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশকে এক্ষেত্রে 'অনুমতির অব্যাহতি' (ওয়েভার) দিতে পারেন, বিশেষত যেখানে 'নন-স্ট্র্যাটেজিক' কৃষিপণ্যই কেবল রপ্তানি করা হচ্ছে দরিদ্র বাংলাদেশ থেকে। তাতে মার্কিন পক্ষের অবস্থান নমনীয় হলো না। রাষ্ট্রদূত বোস্টার সাফ জানিয়ে দিলেন, যদিও পাটের থলি হয়তো বা 'নন-স্ট্র্যাটেজিক' কৃষিপণ্য, তবুও প্রেসিডেন্টের কথিত 'ওয়েভার' মেলার কোনো সম্ভাবনাই নেই বাংলাদেশের। বাংলাদেশ সরকার এ ধরনের উত্তরে হতবাকই হয়েছিল। কেননা ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের পর থেকেই কিউবার সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা হচ্ছিল এবং সে সম্পর্কে গোড়া থেকেই মার্কিন কূটনীতিবিদরা ওয়াকিবহাল ছিলেন। তদুপরি, প্রায় একই সময়ে মিসর যখন কিউবায় রপ্তানি করছিল, তখন তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কোনো প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নেয়নি। মিসর থেকে কিউবায় তুলা রপ্তানিতে সেদিন কোনো বাধা ওঠেনি; কিন্তু বাংলাদেশ থেকে পাট রপ্তানিতে সেদিন প্রবল বাধা উঠেছিল। এই রহস্যের উত্তর খোঁজাও দুষ্কর নয় : কিসিঞ্জারের কাছে আনোয়ার সাদাতের 'মিসরকে' হাতে রাখা জরুরি ছিল। আর বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়া বাংলাদেশকে চাপের মুখে রেখে নতি-স্বীকার করানোর কিসিঞ্জারী নীতি পূর্বাপর তৎপর ছিল। এ কথা ক্রিস্টোফার হিচেনস তার 'দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয়ত, শুধু খাদ্যশস্যের সামগ্রিক মাথাপিছু প্রাপ্যতার বিষয়টিকে চুয়াত্তরের 'দুর্ভিক্ষের ব্যাখ্যা' হিসেবে নিলে সরলীকরণ করা হবে। প্রাপ্যতা একটি নির্ণায়ক, তবে একমাত্র, এমনকি প্রধান নির্ণায়ক নাও হতে পারে। ১৯৭৪ সালের উপর্যুপরি বন্যায় প্রচুর ফসলহানির পরেও এটা বলা যেতে পারে। যেমন, ১৯৭৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতার (উৎপাদন+আমদানি) পরিমাণ ছিল ১১.৫৭ মিলিয়ন টন, ১৯৭৪ সালে যা বেড়ে দাঁড়ায় ১২.৩৬ মিলিয়ন টনে। মাথাপিছু খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা (বা availability) ১৯৭৩ সালে ছিল দৈনিক ১৫.৩ আউন্স, যা ১৯৭৪ সালে বেড়ে দাঁড়ায় দৈনিক ১৫.৯ আউন্সে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে দেখলে দুর্ভিক্ষের বছরে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা এর আগের বছরের তুলনায় কিছুটা বেশি বৈ কম ছিল না। জেলা পর্যায়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যানও এ তথ্যকে বাড়তি সমর্থন দেয়। ১৯৭৩ সালের তুলনায় ১৯৭৪ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছিল প্রায় প্রতিটি জেলাতেই (কেবল বরিশাল ও পটুয়াখালী ছাড়া)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা তা হলো, দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে

উপদ্রুত তিনটি বৃহত্তর জেলায়– রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট- খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে তো যায়ইনি বরং লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এ তিনটি জেলায় মাথাপিছু খাদ্যশস্য প্রাপ্যতাও ছিল ১৯৭৩ সালের তুলনায় বেশি। এর থেকে অমর্ত্য সেন এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, 'খাদ্যশস্যের সামগ্রিক প্রাপ্যতা ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষকে ব্যাখ্যা করতে সামান্যই সহায়ক হতে পারে।' সেনের মতে, সে বছর উপর্যুপরি বন্যার কারণে বিত্তহীন গ্রামীণ শ্রেণি তথা কৃষিমজুর ও স্বল্পবিত্ত বর্গাচাষিদের কর্মসংস্থানের পরিসর সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাস্তবে কমে গিয়েছিল। সেটাকে পুষিয়ে নিতে পারত পরীক্ষিত 'পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম' (কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বা রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম ইত্যাদি)। কিন্তু শেষোক্ত ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারেনি ৩টি কারণে : (ক) সরকারের কাছে ঐ সিস্টেমের মধ্য দিয়ে বণ্টন করার মতো যথেষ্ট খাদ্যশস্য মজুদ ছিল না; (খ) ঐ সিস্টেমটি মূলত শহর এলাকার মধ্যবিত্ত মানুষদের রক্ষার জন্য রেশন-ব্যবস্থা চালু রাখার ব্যাপারেই বেশি সচেষ্ট ছিল; এবং (গ) ছয় হাজারের মতো লঙ্গরখানা চালু হলেও তা যথেষ্ট ছিল না ব্যাপক পরিসরে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য।

চতুর্থত, খাদ্যশস্যের বাজারে বেসরকারি খাতের মজুদদারি প্রবণতাও খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্যকে আরও বেশি করে উস্কে দিয়েছিল। মোটা চালের দামের সূচক (Index of retail prices) যদি ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে হয় ১০০, তা আগস্ট মাসে বেড়ে হয় ১২১, সেপ্টেম্বর মাসে তা লাফ দিয়ে চড়ে যায় ১১৫-এ, আর অক্টোবর মাসে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৮-এ পৌঁছায়। কেবল ডিসেম্বর মাসে তা আবার নেমে দাঁড়ায় ১৩৩-এ। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের উচ্চ ও অপ্রত্যাশিত মূল্যবৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসকে অনিবার্য করে তুলেছিল। এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিকে খাদ্যশস্যের বাজারে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের মজুদদারি ও ফটকাবাজি প্রবণতা ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না। র‍্যাভালিওন এটাকে 'Rational Expectation' মডেল দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। এক হিসেবে, এটা ব্যবসায়ীদের 'যৌক্তিক প্রত্যাশারই' প্রতিফলন।

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্বে খাদ্যশস্যের আমদানি যেখানে হয়েছিল মাসে ২৬৩-২৮৭ হাজার টন করে, সেখানে ১৯৭৪ সালে পূর্বে-উল্লিখিত কারণে আমদানি করা গিয়েছিল মাসে ২৯-৭৬ হাজার টন মাত্র। খাদ্যশস্য আমদানিতে বড় ধরনের ঘাটতি হবে এই পূর্বাভাস পেয়ে ব্যবসায়ীরা খাদ্যশস্যের মজুদ আরও বাড়িয়ে দেয় বাড়তি লাভের আশায় (যে প্রবণতা ইতিপূর্বেই তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের আলোচনায় আমরা দেখেছি)। তবে দুর্ভিক্ষের বছরে সীমান্তের ওপারে এ দেশ থেকে প্রচুর খাদ্যশস্য চলে গিয়েছিল। এই প্রচারের সপক্ষে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ মেলেনি। ব্রায়ান রেডাওয়ে সীমান্ত এলাকায় গবেষণা চালিয়ে দেখান যে, বিডিআর কর্তৃক চোরাচালানির সময় ধৃত মালামালের মধ্যে খাদ্যশস্যের স্থান ছিল '৬ষ্ঠ অথবা ৭ম স্থানে'। তদুপরি সে বছর বাংলাদেশে চালের তুলনামূলক মূল্য (relative price of rice) পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের চালের মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বেশি উঁচুতে অবস্থান করছিল। ফলে এ দেশ থেকে খাদ্যশস্য চোরাচালানি হওয়ার যৌক্তিকতা বা incentive খুব কমই হওয়ার কথা।

যেকোনো কারণেই বা প্রভাবেই ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ ঘটে থাকুক না কেন, এর অশুভ অনুরণন যে দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল– এটা অনুমান করা যায়। এই অনুরণন প্রথমেই ধরা পড়বে সমসাময়িক কবিতা বা কথাসাহিত্যে, নাটকে বা উপন্যাসে। যেমনটা হয়েছিল ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের ক্ষেত্রে। 'নাম

রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থের 'আষাঢ়েরই জয়গান' কবিতার শুরুর পঙ্‌ক্তিগুলোতে বেজে ওঠে বিষ্ণু দে'র স্বর :

'শতাব্দীতে নয়, আজ মন্বন্তর বছর বছর,
প্রতিদিন দুর্ভিক্ষে বর্বর।
পোড়ো জমি। সুদে সুদে দেউলিয়া খেত,
অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি নদীর খালে মৃত্যুতে বন্যার বছর বছর,
এখানে ওখানে। হাল লাঙ্গল ভঙ্গুর। সার নেই, নেই বীজধান
পেশী নেই। রক্তে রক্তে আকালের কালি। রক্তহীন প্রাণ,
কামারের কুমোরের জেলের তাঁতির পঙ্গু হাত
আনন্দের লেশ নেই জীবনযাত্রার জীবিকার'

১৯৪৩ সালের মন্বন্তরকে স্মরণ করে লেখা এই পদাবলি। কিন্তু এসব লাইন ১৯৭৪ সালের পরিপ্রেক্ষিতেও দিব্যি পড়া চলে। সেজন্যেই কবি রফিক আজাদ অত উচ্চকিতভাবে মানচিত্রকে গ্রাস করার হুমকি দিয়েছিলেন। একটা অমীমাংসিত ক্ষোভ আর একটা অবর্ণনীয় ক্রোধ মিলেমিশে একটা দুর্বাসা-অভিসম্পাতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল সেদিন। এর কালছায়া ছড়িয়ে পড়েছিল প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে। নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় সেকারণেই কি ১৯৭৩ সালেই পড়েছিলাম 'আমি চালের আড়তকে নারীর নগ্নতা বলে ভ্রম করি', বা শামসুর রাহমান লিখেছিলেন 'দুঃসময়ের মুখোমুখি', বা শুনেছিলাম আবুল হাসানের উদ্বিগ্নে-ভরা উচ্চারণ 'রাজা যায় রাজা আসে'? বা এ কারণেই কি কিছু পরে শহীদ কাদরী লিখবেন– 'কোথাও কোন ক্রন্দন নেই'? এরকম অবস্থায়, দুর্ভিক্ষের ঐ বছরে, যেসব তরুণ-তরুণী প্রথম প্রেমে পড়েছিল, তারাও জানত– এ পরিস্থিতিতে প্রেম করাও অন্যায় : 'প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সঙ্গে ঠিকই, কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না।'

কবিতার কথা থাক্, কথাসাহিত্যে ১৯৭৪-র দুর্ভিক্ষ যতটুকু এসেছে, সেটা ভয়াবহ। হান্নাহ আরেন্ড (Hannah Arendt) হলোকাস্টের পরে মানুষ আর নিজেকে 'নির্দোষ' বলে দাবি করতে পারবে না– এ কথা বলেছিলেন। দুর্ভিক্ষ আমাদের কিছুকালের জন্যে হলেও 'সভ্যতার থেকে' বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। সেই সাথে মরে গিয়েছিল আমাদের সত্তার ভেতরের শৈশব-কৈশোরের প্রাণচঞ্চল উপস্থিতি। কিছু একটা মানবিক সেবছর আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিক জীবন থেকে চিরকালের জন্য মুছে গিয়েছিল। মানুষের মধ্য থেকে সহজেই অনুমেয় সহমর্মিতা উঠে গিয়েছিল। এবং এরই প্রতিক্রিয়ার চাপে প্রবল ঘোরের মধ্যে লিখিত হয়েছিল হাসান আজিজুল হকের কিছু গল্প সেদিন। আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই তার 'মধ্যরাতের কাব্যি' ও 'সরল হিংসা' গল্প দুটি।

মধ্যরাতের কাব্যি-র বিষয়বস্তু ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ। ঘটনার স্থান ঢাকার রেলস্টেশন, যেখানে জোয়ারের মতো নামছে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষ। দাদি আর নাতনির মধ্যে কথোপকথনের ওপরে গল্পটি কাঠামোগতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দাদি চোখে ঠিক দেখতে পায় না, নাতনির বয়স খুবই কম– ঠিক কত তা পড়ে জানা যায় না। তবে সে যে কিশোরী এটা বোঝা যায়। যে–পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে কথোপকথন চলছে তা এরকম :

১. 'দুদিন আগে একটা ট্রেনে চেপে তারা এখানে পৌঁছেছে। সঙ্গে গায়ের অনেক লোক ছিল। অগুনতি মেয়ে-পুরুষ। নাতনি ভেবেছিল দাদি তার পথেই মরবে, ঢাকা আর পৌঁছুতে পারবে না। গত চার-পাঁচদিনে পটাপট তার চোখের সামনেই মরে গিয়েছিল তিন-চারটে বাচ্চা আর গোটা দুই বুড়ো। কিন্তু হাড়ের জোর আছে বুড়ির, এক নাগাড়ে কদিন উপোস দিয়েও ঠিক পৌঁছে গেল।'

২. তবে এই প্রেক্ষিতের আগেও প্রেক্ষিত রয়েছে। সরব দুর্ভিক্ষের আগে সংঘটিত হয় নীরব দুর্ভিক্ষ। এর আগে না-খেতে পেয়ে মারা গেছে বুড়ির উপার্জনক্ষম ছেলে। তাই নিয়ে নাতনির অভিযোগ :

'নাতনি তীব্র চাপা গলায় বলল, আবার মিছে কথা বলছিস! আর রবিবার তোর ছেলে মরল না? তিনদিন না খেতে দিয়ে কাজে লাগিয়েছিলি– তোর ঘরে মরা ছেলে ফিরে এলো না? মিছে কথা বলছিস?

আহারে বাছা, মরে যাই– বুড়ি চুক চুক শব্দ করে জিব দিয়ে।

তোর নিজের প্যাটের গর্ত ভরবার লেগে ছেলেকে কাজে পাঠিয়েছিলি– ছেলে তোর গাছতলায় মরে ছিল না?

কী করব বুন– প্যাট যে মানে না।

ছেলে যে গাছতলায় দুম করে পড়ল আর মরল দাদি।

বালাই ষাট, বাছার আলাই বালাই নে আমি মরি।

তুই তো মরিস নি দাদি।'

৩. শেষ পর্যন্ত দাদি আগে মরেনি। কথোপকথনের এক পর্যায়ে নাতনি মৃত্যুর কোলে ক্লান্ত হয়ে ঢলে পড়ে। এক প্রকার প্রলাপ বকতে বকতে।

'নাতনি বলে, তোর ছেলে গেল কোথা দাদি, আমার বাপ? দুলুনি দিয়ে বুড়ি বলে, আহারে কপাল?

তোর গাঁ কই?

বুড়ির দুলুনি, আহারে কপাল!

তোর ভিটে কই?

আহারে কপাল!

এইবার মরতে যাই দাদি?

বুড়ি দুলুনি বন্ধ করে দু'হাতে একগোছা শুকনো চুল ছিঁড়ে বলে, আমার মাথায় যত চুল তত তোর পরমায়ু হোক।

মরতে যাই দাদি?

হায়, আমার কপাল– বলে বুড়ি উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে।'

৪. এরপরে সেই শিহরণ-জাগানো দৃশ্য। হাসান আজিজুল হক তখন ফিরে গেছেন ১১৭৬-এর মন্বন্তরে, নরমাংস খাওয়ার যে দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছিলেন 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র।

'নাতনির ফেঁপে ওঠা পলকা শরীর। তার ওপর হাত রাখতেই কণ্ঠার হাড়টি মুট করে ভেঙে যায়। সেইটিকে বেশ করে চুষে চুষে খাওয়া হলো...'

কারা খেল, তা বুঝতে ততক্ষণে বাকি নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মতোই এ গল্পের শেষে 'কালো কালো প্রেতের মতো সব মানুষ' চারপাশে ভীড় করে-তাদেরই কেউ হবে।

হাসান আজিজুল হকের 'সরল হিংসা' গল্পটি ততধিক ভয়াবহ। ক্ষুধার জ্বালায় শরীর বিক্রি করতে চাইছে নারীরা। নারী-মাংসের যে খদ্দের, সে এক লোভী কদর্য পুরুষ : 'মোটা থলথলে আ-গড়া এক বামন।' হাতে টাকা নিয়ে সে এক ক্ষুধার্ত নারীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর মেয়েটি ভাবছে, 'সারাদিনে হামি একবার খেনু– দুধ হয়ে বেরিয়ে গেলু, তবে তো হামি আর বাঁচিম না।' কিন্তু মেয়েটি শুধু একা নয়, এরকম অবস্থায় আছে আরও অনেকেই। এবং তারা মেয়েটির প্রতিযোগিনী হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। লেখকের বর্ণনায় শুনুন এরপর।

১. 'সামনে, পিছনে, রাস্তার দিক থেকে, আলোর ভেতর দিয়ে অন্ধকার সরিয়ে মেয়ে মানুষেরা এগিয়ে আসে– সাত আটটি মেয়ে মানুষ। তারা এসে বামন মানুষটিকে ঘিরে ধরে। ... বোবা বামনটির দিকে তারা ঘুরে ফিরে সালাম ঠোকে, এই যে সায়েব, দ্যাখেন, মাত্তর কটা টাকা আমারে দিবেন। তালিই হইবে। এইভাবে জয়তুন, তসিরুন, টেপি, গোলাপি, পুষ্প ইত্যাদি তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যায়।'

২. প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য সবাই একসময় তাদের পরিধানের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পোশাক খুলে ফেলে।

'তবে আমারেও দ্যাখেন– জয়তুন তসিরুনের পাশে দাঁড়ায়। সেও সময় নেয় না।

এই মেয়ে শুকিয়ে রসহীন, পেট সেঁটে গেছে পিঠের সঙ্গে, দ্যাখেন, চারডে বাচ্চা হইছে, আমার দোষ কি, ও সায়েব দ্যাখেন, বয়েসকালে ভালোই ছেলাম। এখন আমার শ্যাষ বাচ্চাডা মরতিছে।...

এইবার বামনকে ঘিরে উলঙ্গ মেয়ে মানুষেরা দাঁড়িয়ে যায়।'

৩. এসব অপ্রত্যাশিত দৃশ্যের সামনে অপ্রস্তুত পুরুষ হতবাক হয়ে যায়।

'বামন হুমড়ি খেয়ে পুষ্পের ওপর পড়তে পড়তে বলে, দোহাই, আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা।

জয়তুন বলে, কী কথা কন সায়েব? আপনের দয়া চাইনে আমরা, ভিক্ষে না, জিনিস নে দাম দ্যান।....

তখন আরম্ভ হয়। নিজেদের মধ্যে তাদের সঙ্গীতের সমন্বয়। অতি চমৎকার ভারসাম্য। কেউ ধরে বামনের হাত, কেউ পা। কেউ চুল বা কোমর। ...বাঘিনীর মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তসিরুন। লোকটার জামা মুহূর্তে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ফেলে। পকেট থেকে একগোছা নোট পড়ে গেলে সে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে লোকটার সামনে এসে বলে, দ্যাখ সায়েব, তর টাকার হাল দ্যাখ।... সবাই মিলে চিত

করে শুইয়ে দেয় লোকটাকে। বামন সব চেষ্টা ছেড়ে দেয়, দু-হাত ছড়িয়ে দেয় দুদিকে, মেলে দেয় দুই পা যতদূর যায়...'

৪. লোকটা মারা গেল এভাবেই:

'সমান তালে লোকটার ঘৃণা কি ভালোবাসা, আক্রোশ বা কষ্টের নিঃশ্বাস চলতে থাকে : তার চোখের ভাব বর্ণনার যখন আর কোনো আশাই নেই, তখন তসিরুন একা সবাইকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তার মুখের ওপর দুই পা তুলে দাঁড়ায়। এইবার আপন বুকে দু-হাতে দমাদম আঘাত করতে করতে সে নগরীর দিকে চেয়ে খলখল করে হেসে ওঠে।'

নগরী মানে ঢাকা মহানগরী। দুর্ভিক্ষ-চলাকালীন ভাবলেশহীন প্রাত্যহিকতায় ব্যতিব্যস্ত বিশাল জনপদের নিষ্করুণ ঢাকা নগরী। দৈনিক এক হাজার রুটি বানানো হতো মিরপুর টেকনিক্যালে– যেখানে আমি বাস করতাম তখন। এই সাহায্যটা সেখানকার অধিবাসীরা করেছিল। সেই রুটি মিরপুরের লঙ্গরখানায় প্রতিদিন পৌঁছে দেওয়া হতো। আমাদের বিবেক ওই পর্যন্তই কাজ করেছিল। আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে পড়ালেখা করেছি; বিকেল বেলায় টেবিল টেনিস, সন্ধ্যের মুখে আলিয়ঁসে গিয়ে 'ফরাসি ভাষা শিক্ষা', আবৃত্তি করতাম বোদলেয়ারের 'ল ফ্ল্যুর দ্যু মাল' (ক্লেদজ কুসুম), এভাবেই কেটেছে শাহরিক দিন-রাত্রি। দুর্ভিক্ষের কথা নিয়ে সরগরম আলোচনা হতো চায়ের আড্ডায়, ক্লাসরুমে বা খেলার মাঠে, মনে পড়ে না। শহরের মধ্যবিত্তরা গ্রামের এই অভূতপূর্ব দুর্ভিক্ষকে কী করে এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল? বাসন্তী কাপড় না পেয়ে জেলেদের জাল জড়িয়ে আছে-সেই ছবি আমরা দৈনিক পত্রিকার পাতায় দেখেছি কতবার। বাসন্তীর বাড়ি কুড়িগ্রামে-সেই বাড়িতে গিয়ে তার ওপরে কোন 'এথনোগ্যাফিক' বিবরণী কি আমরা করতে চেয়েছি দুর্ভিক্ষের পরে? দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে এই স্মৃতিক্ষয়ের কারণেই কি 'চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ'কে নিয়ে আমরা সেভাবে উচ্চকিত বা আলোড়িত হইনি? মুক্তিযদ্ধে শহীদ ৩০ লক্ষ, ৭৪-র দুর্ভিক্ষে নিহত ১৫ লক্ষ-এ পরিসংখ্যান কতটা আমরা মনে রেখেছি? এ জন্যেই কি আমরা স্মরণযোগ্যভাবে এখনও পাইনি বিভূতিভূষণের অশনি সংকেতের মতো কোনো উপন্যাস, বা বিজন ভট্টাচার্যের নবান্নের মতো কোনো নাটক? এই প্রশ্ন ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইল।

নওমী হোসেন ২০১৭ সালে লিখেছেন একটি তাৎপর্যপূর্ণ বই : 'দ্য এইড ল্যাব : আন্ডারস্টেন্ডিং বাংলাদেশ আনএক্সপেক্টেড সাকসেস'। বইটিতে তার একটি প্রধান তর্ক হলো, ১৯৭৪-র দুর্ভিক্ষ না হলে বাংলাদেশ'স নড়ে-চড়ে বসত না। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা তাড়া করে বেড়ানোর কারণেই এ দেশ অন্যান্য তুলনীয় দেশের প্রেক্ষিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারকে কমিয়ে আনা, নারীদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য, চরম দারিদ্র্য প্রশমনে বিশেষ উন্নয়ন বা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, উন্নয়নে এনজিওদের ভূমিকা প্রভৃতি কর্মসূচিকে পূর্বাহ্নেই স্বীকৃতি দিতে পেরেছিল। অনেক সময়ে সংকটে পড়েই তবে মানুষের বা দেশের বোধোদয় হয়। নওমী হোসেনের কথায় অতিশয়োক্তি থাকতে পারে। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের আগেও বেগম রোকেয়ার চিন্তা-ভাবনা, পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের নারী আন্দোলন, এবং তদ্‌জনিত নানাবিধ কারণে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছিল। ষাটের দশকেই রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম ও 'সবুজ বিপ্লব'-এর ডাক দেওয়া হয় এদেশে। ১৯৭৩ সালেই গৃহীত হয় ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা– সেখানে নারী শিক্ষা, কৃষিমুখীন উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ইত্যাদি অর্থনৈতিক নীতিমালা

ঘোষিত হয়। ১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধানে প্রতিশ্রুত হয়– কার্ল মার্কসের 'ক্রিটিক অব দ্য গোথা প্রোগ্রাম' থেকে সেই বিখ্যাত আপ্ত-বাক্য– 'সবাইকে শ্রম অনুযায়ী বণ্টনের' সমতামুখী নীতিমালা। তারপরও আমার মনে হয় যে, ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নওমী ঠিকই করেছেন। তবে তিনি তার লেখায় মূলত পলিসি-ফ্রন্টে 'ইতিবাচক প্রভাবের' ওপরই জোর দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং এর দীর্ঘমেয়াদি অশুভ প্রভাবের বিষয়টি তার আলোচনায় তেমনভাবে আসেনি। এ নিয়ে ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার গবেষকদের আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে বলব। অর্থনীতিবিদরাও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে পারেন।

গ্রন্থপঞ্জি

I. References in English

Alamgir, M. (1980): *Famine in South Asia: Political Economy of Mass Starvation, Oelgeschlager*, Gunn and Hain, Cambridge, MA.

Basu, K. (2003): *Analytical Development Economics: The Less Developed Economy Revisited*, MIT press.

Davis, M. (2002): *Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World*, London: Verso Books.

Dutt, R. C. (1980): *The Peasantry of Bengal*, Reprint, Calcutta: Manisha.

Ghosh, M. (2014): *Impact of Famine on Bengali Literature*, New Delhi, Blauyanske Publishing.

Hossain, N. (2017): *The Aid Lab: Understanding Bangladesh's Unexpected Success*, Oxford University Press.

Hunter, W. W. (1868): *The Annals of Rural Bengal*, Vol. 1, New York: Leypoldt and Holt (available in Internet Archive).

Islam, N. (2003): "What Was It About the 1974 Famine," *Making of a Nation, Bangladesh: An Economist's Tale*, pp. 221-246, Dhaka: The University Press Ltd.

Mukerjee, M. (2011): *Churchill's Secret War: the British Empire and the Ravaging of India during World War II*, New York: Basic Books.

Osmani, S. R. (1995): "The Entitlement Approach to Famine: An Assessment" in K. Basu, P. Pattanaik and K. Suzumura (eds). *Choice, Welfare, and Development: A Festschrift in Honour of Amartya K. Sen*, pp. 253-294, Oxford: Clarendon Press.

Patnaik, U. (2018): "Profit Inflation, Keynes and the Holocaust in Bengal, 1943–44," *Economic & Political Weekly*, 53(42), 33.

Ravallion, M. (1987): *Markets and Famines*, Oxford: Clarendon Press.

Sen A. (1981): *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, Oxford: Clarendon Press.

Sen, E. (1944): *Darkening Days, being a Narrative of Famine-Stricken Bengal (with Sketches by Zainul Abedin)*, Susil Gupta, Calcutta.

Sobhan, R. (1979): "Politics of Food and Famine in Bangladesh," *Economic and Political Weekly*, Dec 1:1973-80.

Watts, M. (2003): Ed. *The Literary Book of Economics*, ISI Books, Wilmington.

II. References in Bengali

Amitrasudan Bhattacharya (2015): *Bankimchandra Jibani*, Ananda Publishers, Kolkata.

Bibhutibhusan Bandopadhyay (1998): "Asni Songket," *Bibhuti Rachanavali*, Vol. 10, Mitra & Ghosh Publishers, Kolkata.

Bhudeb Mukhopadhyay (2010): "Samajik Probondho," *Probondho Somogro*, Charyapada: Kolkata (in Bengali).

Bankim Chandra (2004): "Bongodesher Krishak," *Bankim Rachanabali: Sahitya Somogro*, Tuli-Kalam, Kolkata.

Bankim Chandra (2016): "Anandamoth," *Bankim Rachana Somogro*, Biswa Sahitya Bhavan, Dhaka.

Hasan Azizul Huq (2016): *Golpo Somogro*, Vol. 1 & 2, Dhaka.

Humayun Ahmed (2007): *Modhyanyo*, Onnoy Prokash, Dhaka.

Mahbub Ul Alam Chaudhury (2008): *Smritir Sandhaney*, Palok Publishers, Dhaka.

Shibram Chakraborty (1985): "Rinong Kritta," *Shibram Rochona Somogro*, Annapurna Publication, Kolkata.

Subrata Roychowdhury (2011): *KothaSahitya: Monnontorer Dingulite*, Kolkata.

Tarasankar Bandyopadhyay (1998): "Monnontor," *Tarasankar Rachanavali*, Vol. 5, Mitra & Ghosh Publishers, Kolkata.

III. Archival Documents

Hindu Hitoishini, 20 July 1878.

Dhaka Prakash, 21 July 1878; 3 November 1878; 22 November 1878.

Bharat Mihir, 27 July 1878; 5 September 1878.

Hindu Ronjika, 14 August 1878.

Samachar Chandrika, 30 August 1878; 20 November 1878.

Somprakash, 18 November 1878.